সোভিয়েট দেশে ১৯৪৮-এ জীববিজ্ঞান নিয়ে তুমুল সমালোচনা হয়, শেষ পর্যন্ত ঘোষিত হয় মিচুরিন্-লাইসেনকোর বিপ্লবী জীববিজ্ঞানের জয়। একেবারে ঘরোয়া ভাষায় তারই পরিচয় এই গ্রন্থে, বোঝবার যাতে সুবিধে হয় এই জন্যে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসটুকুর খসড়াও করা হয়েছে।

জীববিজ্ঞানে বিপ্লব

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জীববিজ্ঞানে বিপ্লব

জীববিজ্ঞানে বিপ্লব

— ডারউইন, লেমার্ক, মেণ্ডেল, ভাইসম্যান, লাইসেন্‌কো —

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান
দি ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ
৮৯ হ্যারিস্যান রোড, কলকাতা ৭

৫ ও ৬ নং চৌরঙ্গি টেরাসের শ্রীশক্তি প্রেস থেকে
বীরেন সিমলাই কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ১১বি
চৌরঙ্গি টেরাস থেকে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ-শিল্প : শ্রীযুক্ত খালেদ চৌধুরী

প্রথম সংস্করণ
জুলাই ১৯৫১

দাম এক টাকা আট আনা

চিত্তপ্রসাদ
শিল্পী বন্ধুকে

"নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ" বইতে মতবাদগত আলোচনার জায়গা হয়নি। বইটি বেরুবার পর অনেকে অনুরোধ করেন এ-আলোচনা সুরু করতে। তার একটি প্রধান অংশ লাইসেনকো-র বিপ্লবী জীববিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা। অতএব, এই বিষয়ে "নতুন-সাহিত্য" পত্রিকার ধারাবাহিক ভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি, প্রধানত সেই প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করে এই বই বের করলাম। ভবিষ্যতে, মতবাদগত অন্যান্য আলোচনা করবারও বিশেষ আগ্রহ রইলো।

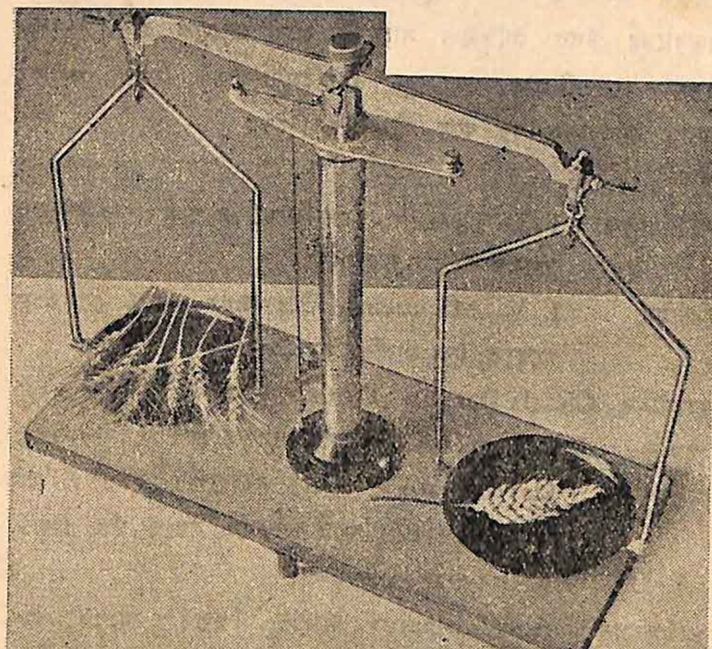
"নতুন সাহিত্য"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিল সিংহ নানান ভাবে সাহায্য করছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

"দি ইণ্টারন্যাসান্যাল্ পাব্লিসিং হাউস লিঃ" অধিকাংশ ব্লক ব্যবহার করতে দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন।

কলকাতা
১৫।৬।৫১

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিজয়ী জীববিজ্ঞানের কীর্তি



পটভূমি

১৯৪৮-এ ৩১শে জুলাই থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত সোভিয়েট দেশের প্রধান কৃষিবিজ্ঞান-কেন্দ্রের (Lenin Academy of Agricultural Sciences of the U. S. S. R.-এর) অধিবেশন হয়। অধিবেশনের আলোচনায় যোগ দেন এই বিজ্ঞান কেন্দ্রের ৪৭ জন সভ্য, কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মী, অধ্যাপক, যৌথ-খামারের অধিনায়ক, ইত্যাদি, সবশুদ্ধ ৭০০ জন। আলোচনার ফলে, মেণ্ডেল-ভাইস্‌ম্যানের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সাবেকী জীববিজ্ঞানকে প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ বলে সিদ্ধান্ত করা হয়, মিচুরিন্‌-প্রবর্তিত বিপ্লবী পথকেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পথ বলে স্বীকার করা হয়।

জীবনী পরিচয়

লাইসেনকো : T. D. Lysenko : সোভিয়েট দেশে প্রধান কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বর্তমান সভাপতি।

মিচুরিন : I. V. Michurin : উদ্ভিদ-জগৎ সম্বন্ধে সোভিয়েট গবেষক, নব্য জীববিজ্ঞানের প্রবর্তক।

ডারউইন : Charls Darwin : ইংরেজ জীববিজ্ঞানী। ১৮০৯—১৮৮২।

লেমার্ক : J. B. Lamarck : ফরাসী জীবতত্ত্ববিদ। ১৭৪৪—১৮২৯।

মেণ্ডেল : G. Mendel : অস্ট্রিয়ার মঠাধ্যক্ষ। মটরশুঁটি গাছ নিয়ে পরীক্ষার ভিত্তিতে বংশগতি সম্বন্ধে মত প্রবর্তন করেন। ১৮২২—১৮৮৪।

ভাইস্‌ম্যান : A. Weismann : জার্মান পণ্ডিত। সাবেকী বংশ-গতিবাদের প্রধান প্রণেতা। ১৮৩৪—১৯১৪।

১

কোমরের সমান উঁচু সোনালী গমের শিষ। যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত, দিগন্ত পর্যন্ত। আর তারই মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ। ছবিতে দেখলাম। লাইসেনকোর ছবি। এ-ছাড়া লাইসেনকোর আর কোন ছবি আমি দেখিনি। পটভূমিতে পাকা ফসলের ক্ষেত, যেন আদিগন্ত স্বর্ণময়ী সমুদ্র, পৃথিবীতে প্রাচুর্যের বন্যা। পরনে ওদের দেশের—অর্থাৎ ওই অবস্থাপন্ন দেশের—সাধারণ কর্মঠ কৃষক যে-ধরনের জামা কাপড় পরে সেই ধরনের জামা কাপড়। ক্ষেতে-খামারে গতর খাটাবার সময় ওরা সাধারণত যে-রকম টুপি পরে সেই রকমেরই টুপি। মনে হল, অসাধারণের মধ্যে শুধু চোখ দুটো, দুটো জলজলে চোখ—গমের ওই রকম প্রায় অবিশ্বাস্য পুষ্ট শিষ না দিগন্ত ছোঁয়া প্রাচুর্যের ওই বন্যা, মানুষের সৃষ্টির ঠিক কোন্ দিকটার দিকে চেয়ে চোখ দুটো অমন উজ্জল হয়ে উঠেছে ছবিটুকু থেকে তা ঠাওর করা গেল না।

বিরক্ত হয়ে কেউ নিশ্চয়ই বলবেন: বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে

বসে এমনতর বীরপূজো কেন? কেন একজন ব্যক্তিবিশেষের বর্ণনা নিয়ে এমন মাতামাতি? তার পটভূমি, তার বেশভূষা, আর ছবিতে ঠিক কিসের দিকে চেয়ে তার চোখ দুটো অমন উজ্জ্বল—এই সব অবান্তর কথা তুলে পাঠকের মন ভোলাবার চেষ্টাটা নিশ্চয়ই সাধু-উদ্দেশ্য নয়। ছেলেমানুষের মত ভাবাবেগ আর রঙিন উচ্ছ্বাস দিয়ে কি বৈজ্ঞানিক সমস্যার কিনারা করা চলবে? তাও যেমন তেমন কোন সমস্যা নয়, এমন এক সমস্যা যা নিয়ে কিনা আজ দুনিয়াজোড়া কোলাহল! লাইসেনকোর স্বপক্ষে আর বিপক্ষে দু-দিকেই অনেক অজস্র আর অনেক তীব্র মন্তব্য।

জানি, বীরপূজো দিয়ে বৈজ্ঞানিক সমস্যার কিনারা হয় না। তবু লাইসেনকোর ওই ছবির কথা অবান্তর নয়। বরং, জীববিজ্ঞান নিয়ে আজকের দিনে এত যে সোরগোল সে-সম্বন্ধে আলোচনা তোলবার সময় ছবিটার কথাই খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। আসলে ওই ছবির মধ্যে কয়েকটি ব্যঞ্জনা রয়েছে এবং জীববিজ্ঞান নিয়ে এত বাদানুবাদের জটিলতার মধ্যে দিয়ে পথ খোঁজবার ব্যাপারে ব্যঞ্জনাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান মূলসূত্র হবে। তার কারণ, যদিও আপাতত মনে হতে পারে এই বাদানুবাদ বংশগতির সমস্যা নিয়ে দুটি বিরুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মতবাদের সংঘর্ষ মাত্র তবুও, আসলে এর পেছনে রয়েছে বিজ্ঞান সম্বন্ধেই দুটি বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরোধ। একটি দৃষ্টিভঙ্গি হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, লাইসেনকোর ওই ছবির মধ্যে যে-দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট স্বাক্ষর। আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি হল ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি, পরমাণু-বিস্ফোরণের নরমেধ প্রস্তুতিতে আজ যার চরম করাল রূপ। আমাদের দিন কাটে সমাজতান্ত্রিক সমাজে

নয়, তাই প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের মনের কাছে ঠিকমত পেশ করা হয় না। তার বদলে, বিজ্ঞান বলতে ধনতান্ত্রিক সমাজ যা বোঝে সেই কথাগুলো নিয়ে আমাদের মনের ওপর এমনভাবে পসার করার ব্যবস্থা যে নিছক এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটাকেই আমরা একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত হই, অস্বস্তি বোধ করি প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি হলে।

লাইসেনকোর ওই ছবিটার কথাই ধরা যাক। প্রথমত ওই কি কোন বৈজ্ঞানিকের ছবি? অন্তত বৈজ্ঞানিক বলতে বাকি সভ্য দুনিয়া এতদিন আমাদের যা বোঝাতে চেয়েছে আর আমরা যা বুঝতে অভ্যস্ত হয়েছি তার চিহ্ন ওই ছবির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। মাথার টুপিতে নয়, পরনের কাপড় জামাতে নয়, পটভূমিতে যে আদিগন্ত সোণালি প্রাচুর্যের বন্যা তারও কোথাও নয়। ছবিটা যদি অবস্থাপন্ন কোন এক দেশের সাধারণ কোন এক কৃষকের ছবি হত তাহলে আমাদের অভ্যাসে খটকা লাগত না। সোনালী ফসলের দিকে চাষীর চোখ আবদ্ধ হলে সে-চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে বৈ কি। কিন্তু আবাদের দিকে চেয়ে বৈজ্ঞানিকের চোখ আনন্দ-বিহ্বল হবে, এ-কথা কল্পনা করাই আমাদের পক্ষে কঠিন। ওই ছবি আসলে হল চাষাভূষোর ছবি; যারা খেতে-খামারে গতর খাটায়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায়, তাদেরি একজনের। ওই ছবির মধ্যে আমরা বৈজ্ঞানিককে খুঁজে পাব কেমন করে? অথচ অন্তত ৮৩৪৮১০০ বর্গমাইল জোড়া এক দেশ—যে-দেশে অন্তত ১৯৩১৯৮০০০ জন মানুষের বাস,—আজ কিনা এই লোকটিকেই বিজ্ঞানের এক ক্ষেত্রে চরম সম্মান দেবার আয়োজন করেছে! এমন নয় যে দেশটা নেহাৎই

তাচ্ছিল্য করবার মত মূর্খের এক দেশ : ওই দেশেই রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক যজ্ঞের আয়োজন, ও দেশ দেখতে না গেলে তাঁর "তীর্থ দর্শন এ জন্মের মতো অসমাপ্ত থাকতো!" কেননা ওরা পণ করেছে পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী গড়বার আর এই কাজে ওরা যে-হাতিয়ারকে একমাত্র হাতিয়ার বলে চিনেছে সে হাতিয়ার বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়! অতি বড় নিন্দুকের পক্ষেও আজ এই কথা মুখ ফুটে বলা কঠিন যে ওরা বিজ্ঞানকে মানে না বা কদর বোঝে না বিজ্ঞানের। ওদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, ওদের সাফল্যের প্রতিটি খুঁটিনাটিতে, স্বাক্ষর রয়েছে বিজ্ঞানের উপর একান্ত নির্ভরতার। ওরা যদি বিজ্ঞানকে না মানতো, বিজ্ঞানের কদর যদি না বুঝত, তাহলে ওদের পক্ষে অন্তত নাৎসী আক্রমণের মত অমন প্রচণ্ড আক্রমণকে বিধ্বস্ত করা সম্ভব হত না। তবু, ওই ছবি দেখবার পর লাইসেনকোকে বৈজ্ঞানিক বলে মেনে নিতে আমাদের অভ্যাসে সত্যিই খটকা লাগে। কেননা বৈজ্ঞানিককে চেনবার ব্যাপারে আমাদের অভ্যাসটা একেবারে অন্য রকমের। তার পটভূমিটা অন্যরকম হওয়া চাই, অন্যরকম হওয়া চাই তার বেশভূষা, তার দৃষ্টি আবদ্ধ থাকা চাই অন্য এক দিকে—আর তবেই আমাদের অভ্যাস তাকে বৈজ্ঞানিক বলে মানবার পথ ছেড়ে দেবে। পটভূমি? বৈজ্ঞানিকের পটভূমিটা হবে কোলাহল-মুখর মূর্ত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ল্যাবরেটরীর শান্ত আর নির্লিপ্ত আবহাওয়া, সেখানে জটিল যন্ত্রপাতি আর অজস্র টেস্ট টিউবের ভিড় থাকবে নিশ্চয়ই, কিন্তু আদিগন্ত সোনালী ফসলের জায়গা সেখানে নেই। বৈজ্ঞানিকের বেশভূষা আর কর্মী কৃষকের বেশভূষা, এ-দুয়ের মধ্যে মিল কোথায়? চাষীর সাজে সাজলে বৈজ্ঞানিকের ইজ্জত

বজায় থাকবে কেমন করে? সত্যি কথা বলতে বৈজ্ঞানিককে একটু-আধটু রহস্যময় আলোয় দেখতে না পেলে আমাদের মন ঠিকমত খুশি হতে চায় না। কেননা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগসূত্রটা বড় ক্ষীণ, আমরা ল্যাবরেটরিকে দেখি দূর থেকে, অল্পবিস্তর রহস্যময় ভাবে। আর বৈজ্ঞানিক হলেন সেই রহস্যপুরীর নায়ক। তাই বৈজ্ঞানিককে রহস্যঘন চোখে না দেখতে পেলে এই রহস্যময় আবহাওয়ার সঙ্গে সেই রহস্যের নায়ককে কেমন করে আমরা খাপ খাওয়াবো? আর দৃষ্টি? বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি কোন্ দিকে আবদ্ধ থাকবে? মাটির দিকে? ক্ষেতের দিকে? ফসলের দিকে? নিশ্চয়ই নয়, মোটেই নয়। কেননা আমাদের চলতি অভ্যাস অনুসারে বৈজ্ঞানিককে আমরা দেখতে চাই একরকম আত্মভোলা আর আধ-পাগলা মানুষ হিসেবে, দুর্বোধ্য সংকেত দিয়ে গড়া বিশুদ্ধ জ্ঞানের যে জগৎ সেই জগৎ নিয়েই তিনি তন্ময়। যা দেখে চাষাভূষোর চোখ চকচক করে ওঠে তাই দেখে যদি বৈজ্ঞানিকের চোখও চকচক করে তাহলে আমাদের সমস্ত কল্পনা· সমস্ত স্বপ্নই যে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

এক কথায়, বৈজ্ঞানিক বলতে আমরা সাধারণত বুঝি এক আত্মভোলা আর আধ-পাগলা জ্ঞান-বিভোর আজব মানুষ। যারা ক্ষেতে-খামারে আর কলকারখানায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা নেহাৎই ইতর জনতা, এমন কি যারা দৈনন্দিন জীবনের মূর্ত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়, মেতে ওঠে সমাজ-কল্যাণের সমস্যায়, তারাও ঠিক বৈজ্ঞানিক নয়, তারা হল রাজনৈতিক বা ওই ধরণের যা হোক একটা কিছু। বিজ্ঞান সম্বন্ধে, বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে, এই হল আমাদের চলতি ধারণা। এই

ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে দুটি মূল কথা পাওয়া যায়। এক হল, জ্ঞানের সঙ্গে (অতএব বিজ্ঞানের সঙ্গেও, কেননা বিজ্ঞান শুধু 'বিশেষ জ্ঞান', তাছাড়া আর কী) মেহনতের কোন সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুক বিশ্বের রহস্য, বৈজ্ঞানিক বিভোর হয়ে থাকুক সেই রহস্য নিয়ে। তাই প্রয়োগের বা বাস্তব কর্মের যে জীবন সেই জীবনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের কোন সাক্ষাৎ যোগাযোগ থাকাটা শোভন নয়। আর দ্বিতীয় কথা হল, জনগণের সঙ্গে—সাধারণ মানুষের সঙ্গে—বিজ্ঞানের বা বৈজ্ঞানিকের সম্পর্ক নেই। জনগণের সমস্যা বৈজ্ঞানিকের সমস্যা নয়, বৈজ্ঞানিকের সমস্যা জনগণের সমস্যা নয়। জনগণ হয়তো বৈজ্ঞানিকের গবেষণা থেকে দৈনন্দিন জীবনে কিছুটা লাভবান হতে পারে; কিন্তু এ-তো বিজ্ঞানের কাছ থেকে নিছক উপ্‌রি পাওয়া, এই পাওয়ার পরিচয়েই বিজ্ঞানের আসল পরিচয় নয়।

আসলে অবশ্য এই দুটো কথা আলাদা-আলাদা কথা নয়, বরং একই কথার দুটো দিক, এ-পিঠ ও-পিঠ যেন। সেই মূল কথাটা হল জ্ঞান আর মেহনতের মধ্যে বিরোধের কথা। আমরা যে-সমাজে বেঁচে আছি সেই সমাজের ভিত্তিতেই জ্ঞান আর মেহনত একেবারে পৃথক হয়ে গিয়েছে, ভূমিকম্পে চিড় খেয়ে পাহাড় যে-রকম দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায় আর মাঝখানে দেখা দেয় বিশাল গভীর খাদ, সেই রকমই। অবশ্য পৃথক হয়েছে অনেক দিন আগেই, যখন থেকে শ্রেণীসমাজ দেখা দিয়েছে তখন থেকেই। তখন থেকে মেহনতের দায়টা শুধুমাত্র একদল মানুষের ঘাড়ে; তারা গতর খাটাবে, কিন্তু মাথা খাটাবার মত তাদের সুযোগও নেই, ফুরসৎও নেই। সমাজের অন্য দিকে তখন

থেকেই আর একদল মানুষ : যদিও সংখ্যায় তারা নেহাৎই নগণ্য, তবুও উৎপাদনের উপায়গুলোর উপর তাদের ব্যক্তিগত মালিকানা আর এই মালিকানার প্রসাদেই তাদের নিজেদের পক্ষে গতর খাটাবার কথা ওঠে না। অপরের মেহনত দিয়ে গড়া, ওই জনগণের বা ইতর জনতার মেহনত দিয়ে গড়া সম্পদ লুঠ করবার অধিকার তাদের ; কেননা তারা মালিক, উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিক। গতর খাটাবার তাগিদ নেই বলেই মাথা খাটাবার ঢালাও অবসর। শুধু তাই নয়, গতর খাটানোটা নেহাৎই ইতরের ধর্ম ; যারা গতর খাটায় তারা নেহাৎই ইতর মানুষ। মেহনতের কদরটা বোঝা মালিক শ্রেণীর পক্ষে সম্ভবই নয় : কেননা যে-হাত মেহনত করে, সে-হাত থাকে সমাজের সদর মহলে নয়, অন্দর মহলে। সদর মহলের সুসংস্কৃত আবহাওয়ায় ধূলো কাদা আর কালিঝুলি মাখা মেহনত-কারীর হাত জোড়া নেহাৎই বেখাপ্পা ঠেকবার কথা।

মানুষের সমাজ যখন থেকে দু-ভাগে ভেঙে গিয়েছে, শুরু হয়েছে শ্রেণীসমাজ, তখন থেকেই এই দশা। তখন থেকেই জ্ঞান আর মেহনতের মধ্যে বিরোধ, তখন থেকেই সমাজের সদর মহলে মাথা খাটানোর কথা আর অন্দর মহলে গতর খাটানোর কথা, তখন থেকেই মুখ দেখাদেখি নেই দুয়ের মধ্যে। কিন্তু আজকের দিনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আর বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে আমাদের চলতি ধারণাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটা নতুন বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা আজকের দিনে শুধুমাত্র জ্ঞান আর কর্মের মধ্যে বিরোধ চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে এমন কি বৈজ্ঞানিকরাও এই বিরোধকে একান্তভাবেই স্বীকার করে নিয়েছেন, এমন কি বৈজ্ঞানিকেরাও নিজেদের গুটিয়ে নিতে চান

মেহনতের সংস্পর্শ থেকে, বৈজ্ঞানিকরাও বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন মেহনতকারীদের হট্টগোলে, জনতার হট্টগোলে, নিজেদের মিশতে দেওয়া মানে বিজ্ঞানভ্রষ্ট হওয়া। জ্ঞান আর কর্মের মধ্যে বিরোধটা নতুন নয় ; নতুন কথা হল, এই বিরোধ আজকের বৈজ্ঞানিককেও কেমন ভাবে কাবু করেছে। নতুন কথা, তার কারণ এমনটা এর আগে সত্যিই ছিল না। বিজ্ঞানের সঙ্গে মেহনতের—অতএব মেহনতকারীদেরও—সম্পর্কটা ছিল সাক্ষাৎ সম্পর্ক। আর তা ছিল বলেই সামন্ততন্ত্রকে ধূলিসাৎ করবার সময়, সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের পরাস্ত করবার সময় বিজ্ঞান হয়ে উঠেছিল ক্ষুরধার হাতিয়ার। তখনকার ইউরোপে শ্রেণীসংগ্রামের ছবিটা স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে : একদিকে সামন্ততান্ত্রিক মালিকের দল—রাজা উজির আর জমিদার পুরোহিতের দল। আর একদিকে জনগণ, মেহনতকারীর দল। এই দ্বিতীয় দলটার নেতৃত্ব ছিল উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর। কিন্তু বুর্জোয়া বলতে আজকাল যে পরোপজীবী শোষক বোঝায় তখনকার দিনে তা বোঝাত না। যে ভূমিদাসেরা জমিদার শ্রেণীর কাছে মূল্য চুকিয়ে স্বাধীন নগরবাসী হতে পেরেছিল তারাই ইতিহাসে প্রথম বুর্জোয়া শ্রেণীর অঙ্কুর। তখনকার দিনের বুর্জোয়া শ্রেণীও তাই মেহনতকারী জনগণেরই অঙ্গ। মেহনতের শক্তিই ছিল তাদের আসল শক্তি, শেষ পর্যন্ত এই শক্তির কৃপাতেই তারা পরান্নজীবি সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল। বিজ্ঞান তখন কোন্ দিকে? বিজ্ঞানী তখন কোন্ দিকে? মনে রাখতে হবে তখনকার দিনের ইন্‌কুইজিসন : শোষকদল কী রকম মরীয়ার মত রুখে দাঁড়িয়েছিল বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে! ব্রুনো। গ্যালিলিও! আরো অনেকে। রয়াল সোসাইটির যাঁরা

প্রথম সভ্য তাঁরা প্রাণের ভয়ে, অত্যন্ত গোপনে, বিজ্ঞানের আসরে যাতায়াত করতেন। শোষকের দল বিজ্ঞানকে ভয় করেছে, বিজ্ঞান তখন উদীয়মান শ্রেণীর হাতের অস্ত্র। সেই শ্রেণী মেহনতকারীদের শ্রেণীর নেতা, তাই মেহনতের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্কটা তখন ঘনিষ্ঠ।

তারপর ক্রমশ এই বুর্জোয়া শ্রেণীরও ঐতিহাসিক অবদান ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল, শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে মেহনতকারী জনতার সংগ্রামে নেতৃত্বের বদলে এই বুর্জোয়াশ্রেণীই ক্রমশ শোষকমাত্রে, পরান্নজীবীমাত্রে পরিণত হতে লাগল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বদলে দেখা দিল পূর্ণ ধনতান্ত্রিক সমাজ; এই নতুন সমাজে উৎপাদনের উপায়গুলোর উপর চরম মালিকানা বুর্জোয়া শ্রেণীরই। সেই শ্রেণীর কাছে পরম পুরুষার্থ মুনাফা। আঁক কষলে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় মুনাফার একমাত্র উৎস হল মেহনতকারীদের শোষণ করার প্রথা! কাজেই এ-কথা বুঝতে একটুও অসুবিধে হওয়া উচিত নয় কেন বুর্জোয়া শ্রেণীব কাছে জীবনের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল মেহনতকারীদের শোষণ করা। যে-বুর্জোয়া শ্রেণী একদিন অত বড় ঐতিহাসিক মহানাট্যের প্রধান নায়ক ছিল, ছিল শোষকদলের বিরুদ্ধে মেহনতকারীদের সংগ্রামে অমন অগ্রগামী সৈনিক, সেই বুর্জোয়া শ্রেণীই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল সবচেয়ে স্থূল পরোপজীবী, সবচেয়ে নির্মম ডাকাত।

কিন্তু বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক? এই পরিবর্তনের মধ্যে বিজ্ঞানের কী হল, কী হল বৈজ্ঞানিকের? মেহনতের সঙ্গে, প্রয়োগ-জীবনের সঙ্গে, বিজ্ঞানের সেই পুরনো সৌহার্দ্য কি বজায় রইলো? অটুট রইলো কি বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে মেহনতকারীর সেই পুরনো আত্মীয়তা? নিশ্চয়ই নয়। বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐতিহাসিক অবদানে যতই ঘুণ ধরতে লাগল

ততই বিজ্ঞান যেন ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে নিতে লাগল সমাজ-জীবনের বিশাল মেহনতের পটভূমি থেকে ল্যাবরেটরির গণ্ডি দিয়ে ঘেরা সংকীর্ণতার মধ্যে। এই সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে যতটুকু প্রয়োগ-জীবন, যতটুকু মেহনত; শুধু ততটুকুর উপর নির্ভর করে, শুধু ততটুকু থেকে প্রাণশক্তি সঞ্চয় করে, বাঁচবার পথ খুঁজতে লাগল বিজ্ঞান। প্রয়োগকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের পক্ষে বাঁচাই সম্ভব নয়, তাই। বিজ্ঞান তো নিছক নির্বিকল্প জ্ঞানচর্চা নয়। ল্যাবরেটরির মধ্যে যতটুকু প্রয়োগ ততটুকুরও সম্বল যদি না জুটত তাহলে বিজ্ঞানের সত্তাই আর থাকত না, বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াত নিছক রহস্যবাদ। অবশ্য এ-দুর্ঘটনা যে একেবারেই ঘটেনি তাও নয়: গত বিশ তিরিশ বছরের বৈজ্ঞানিক রচনা পরীক্ষা করলেই দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে কী পরিমাণ রহস্যবাদের মিশেল হয়েছে। নমুনা হিসেবে জিন্‌স্‌-এডিংটনের কথা বলা হয়। হালের ইউরোপীয় বিজ্ঞানে এই রকম নমুনা খুব বিরল নয়। অপর পক্ষে জনসাধারণের কাছে, ইতর জনতার কাছে বৈজ্ঞানিকের জগৎ ধরা-ছোঁয়ার অতীত, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অতীত এক রহস্যলোক হয়ে উঠতে লাগল। জনগণের কাছে বিজ্ঞান ক্রমশই দুরূহ সংকেত দিয়ে গড়া সাধারণ বোধের অতীত এক রকম কিছুতে পরিণত হল, তাকে দূর থেকে শ্রদ্ধা করবার কথা ওঠে কিন্তু তার কাছ ঘেঁষবার মত কপাল নিয়ে জন্মায় মাত্র মুষ্টিমেয় মানুষ—না, ঠিক মানুষ নয় এক রকমের অতিমানুষ, বা আরো সস্তা কথায় এক রকমের আজব জীব, যাদের নাম বৈজ্ঞানিক, যারা হল ওই রহস্যপুরীর আধপাগলা আর জ্ঞান-বিভোর তন্ময় নায়ক। এক কথায়, বুর্জোয়া সভ্যতার নবযৌবনে

বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক মেহনতের যে আত্মীয়তা ছিল সে-আত্মীয়তা বুর্জোয়া সভ্যতার পরমায়ু যতই ক্ষয়ে আসতে লাগল ততই শেষ হয়ে যেতে লাগল। তার প্রধান কারণ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী আর বৈজ্ঞানিক-গবেষণা সব কিছুই রইল বুর্জোয়া শ্রেণীর কবলে। আধুনিক বুর্জোয়া যুগের শুরু থেকে এই কথা এবং আজ পর্যন্ত এই কথাই। কথাটা ভালো করে না বুঝলে বিজ্ঞানের আসল রূপকে চিনতে পারা যাবে না, বিজ্ঞান সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণার বশ হয়ে থাকতে হবে। প্রথমত ধরা যাক আধুনিক ধনতন্ত্রের যখন শুরু তখনকার কথা। আমরা প্রায়ই মনে করি যে ওই যুগটার মুখোমুখি বিজ্ঞানে কয়েকটি আশ্চর্য আবিষ্কার হয়েছিল, সেই আবিষ্কারের দরুন শিল্প বিপ্লব এবং এই বিপ্লবের দরুনই সামন্ততন্ত্রের গর্ভ থেকে ধনতন্ত্রের জন্ম। হারগ্রীয়েভ্, ওয়াট, ক্রম্টন, কার্টরাইট প্রমুখের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ছোট করবার কথা নিশ্চয়ই ওঠে না। কিন্তু তবুও মনে রাখা দরকার নিছক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও আলাদিনের কোন প্রদীপের মত সমাজের রূপ পরিবর্তন করতে পারে না। ওই যুগটায় বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি অমনভাবে সমাজ বিপ্লব সাধন করতে যে পারল তার আসল কারণ হল তখনকার দিনের উদীয়মান শ্রেণী—বুর্জোয়া শ্রেণী,—এই আবিষ্কারগুলির সঙ্গে সামাজিক মেহনতের যোগাযোগ ঘটিয়েছিল, বুর্জোয়াশ্রেণীর উৎসাহেই ধন উৎপাদনের ক্ষেত্রে আবিষ্কারগুলিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হল। এই ভাবে প্রয়োগ করবার শক্তি বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে যতদিন পর্যন্ত আসেনি ততদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উৎপাদনের সঙ্গে—অতএব সামাজিক মেহনতের সঙ্গে—আত্মীয়তাও স্থাপন করতে পারেনি। শক্তিটা হল কাঁচা টাকার শক্তি।

ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণীর, বিশেষ করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ইংরেজ বুর্জোয়া শ্রেণী. এই শক্তি—অর্থাৎ কাঁচা টাকা—জোগাড় করল বাণিজ্য করে, লুঠ করে, ডাকাতি করে। বাণিজ্য, লুট আর ডাকাতির মেশামেশি ; আর তার চরম লীলা আমাদের এই বাংলা দেশের উপরই। পলাসীর যুদ্ধ। ১৭৫৭। এরই ফলে ইংরেজ বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে এল অগাধ কাঁচা টাকা, এত টাকা যে তার হিসেব করাই কঠিন। এই টাকার শক্তিতেই ইংরেজ বুর্জোয়ার দল পেল প্রবল প্রতাপ ; তখনকার দিনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে তারা গ্রহণ করতে পারল হাতিয়ার হিসেবে। যতদিন পর্যন্ত তাদের আয়ত্তে কাঁচা টাকার শক্তি আসেনি ততদিন পর্যন্ত তাদের পক্ষে সম্ভবই হয়নি বিজ্ঞানকে সামাজিক মেহনতের ক্ষেত্রে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার। ১৭৩৩-এ আবিষ্কার হয়েছিল ফ্লাই শাট্‌ল্‌, ১৭৩৮-এ রোলার-স্পিনিং মেশিন, ইত্যাদি। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে তখনো কাঁচা টাকা যথেষ্ট জমেনি, তাই আবিষ্কারগুলির সঙ্গে সামাজিক মেহনতের যোগাযোগ স্থাপিত হল না। অথচ, ১৭৫৭-র পর থেকে—অর্থাৎ পলাসীর যুদ্ধের পর থেকে.—যখন ইংরেজ বণিকেরা জাহাজ বোঝাই লুটের টাকা আমাদের দেশ থেকে নিয়ে যেতে লাগল তখন থেকে, একের পর এক যে-সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সেইগুলিকে শিল্পে প্রয়োগ, উৎপাদনের অস্ত্র করে তোলা। বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক মেহনতের যোগাযোগ। বুর্জোয়া শ্রেণী সংগ্রহ করল অনেক অনেক টাকা, এই টাকার নাম প্রাথমিক পুঁজি। বুর্জোয়া শ্রেণী গ্রহণ করল বিজ্ঞানকে অস্ত্র হিসেবে, হাতিয়ার হিসেবে। বুর্জোয়া শ্রেণী ডাক দিল জনগণকে, সামন্ততন্ত্রের শিকল ছিঁড়ে এগিয়ে আসতে, মুক্তির দিকে।

যদিও এই মুক্তি শেষ পর্যন্ত পরিণত হল নতুন এক দাসত্বে, —বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে দাসত্বে,—তবুও এ কথায় কোন সন্দেহই নেই যে জনগণ এসে দাঁড়িয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর পাশে। জনগণের শক্তিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তি হল দুর্বার।

প্রাথমিক পুঁজি বিজ্ঞানের হাতিয়ার, জনগণের শক্তি : বুর্জোয়াশ্রেণী দিনের পর দিন জিতে চলল দুর্জয় নায়কের মত। বুর্জোয়া শ্রেণীর যেসব কীর্তি সেই কীর্তির পাশে অতীত ইতিহাসের সপ্তমাশ্চর্যও ম্লান হয়ে এল। বিজ্ঞানের সঙ্গে উৎপাদনের, অতএব সামাজিক মেহনতেরও, সম্পর্ক স্থাপিত হবার ফলে বৈজ্ঞানিকের মনেও তখন অদম্য উৎসাহ। বিজ্ঞান ঘোষণা করল মানুষের জয়। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই একটা ফাঁকি ছিল, সে-ফাঁকি প্রকট হয়ে পড়তে লাগল দিনের পর দিন। ফাঁকিটা হল বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক মেহনতের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের মাঝখানে মালিকদের মুনাফালোভ। দিনের পর দিন বুর্জোয়া শ্রেণীর মুনাফালোভ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল। যত দিন যায় তত স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর মুনাফালোভ একদিকে বিজ্ঞানের গণ্ডী বেঁধে দিয়েছে : বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে যা খরচ-খরচা হবে তা নির্ভর করবে বুর্জোয়া শ্রেণীর খেয়ালখুশির উপর আর বুর্জোয়া শ্রেণীর খেয়ালখুশিটা নির্ভর করবে তার হিসেবের খাতার উপর, লাভ লোকসানের অঙ্কের উপর। ক্রমশই স্পষ্ট ভাবে দেখা যেতে লাগল বিজ্ঞানের কোন্ গবেষণাটা সামাজিকভাবে স্বীকার করা হবে আর কোন্ গবেষণাটাকে ঠিক কোন ধরণের কাজে নিযুক্ত করা হবে আর কোন্ ধরনের কাজে নিযুক্ত করা হবে না—এই সব মূল প্রশ্নগুলির জবাব নির্ভর করতে শুরু করেছে

বৈজ্ঞানিকদের নির্মল বৈজ্ঞানিক বিচারের উপর নয়, জনগণের কল্যাণকারী হিসেবনিকেষের উপরও নয়, তার বদলে যেন এক অদৃশ্য শক্তির উপর। রাজনীতি আর অর্থনীতির জোরালো আলো পড়লে এই শক্তিটার স্বরূপ ধরা পড়ে, দেখতে পাওয়া যায় সে শক্তি আসলে মালিক শ্রেণীর একান্ত অন্ধ মুনাফালোভ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক মেহনতের যে গভীর আত্মীয়তা ছিল মালিক শ্রেণীর মুনাফালোভ বলে চোরা পাহাড়ের ধাক্কায় দিনের পর দিন তা চিড় খেয়ে দু-ভাগে ভেঙে যেতে লাগল : একদিকে বিজ্ঞান আর একদিকে জনগণ বা সামাজিক মেহনত—মাঝখানে বিরাট বিশাল খাদ, অন্ধ মুনাফা শিকারের খাদ। তাই দিনের পর দিন বিজ্ঞান পৃথিবীতে প্রাচুর্য আনবার কৌশলকে আয়ত্ত করলেও, মানুষের শান্তি আর স্বাস্থ্যকে হাতে পাবার উপায় আবিষ্কার করলেও, জনগণের কপাল থেকে অভাব আর অনিশ্চয়তার গ্লানি মুছতে চায় না. পৃথিবীতে আসেনা প্রাচুর্য, স্বাস্থ্য, শান্তি। পৃথিবীতে প্রাচুর্যের বন্যা এলে বাজারে বেচবার যে মাল তার দর পড়ে যাবে, মানুষের জাত যদি স্বাস্থ্যে টলমল করে ওঠে তাহলে ওষুধের কারবারীরা যে কপালে করাঘাত করবে। আর শান্তি? মালিক শ্রেণীর মুনাফা লোভের সঙ্গে আজকের পৃথিবীতে শান্তি বলে ব্যাপারটা কিছুতেই খাপ খেতে চায় না। আজকের দিনে এই কথাটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার। বোঝা দরকার, একটা বিশ্বযুদ্ধের গভীর ক্ষত শুকোতে না শুকোতে কেন আকাশ ছেয়ে উড়ে আসতে চায় নতুন শকুনের দল।

মুনাফা। মুনাফা আসে কোথা থেকে? আঁক কষে মার্কস ফাঁস করে দিয়েছেন মুনাফার গুপ্তকথা। মেহনতকারী মানুষকে শোষণ করাই

হল মুনাফার আদি ও অকৃত্রিম উৎস। মেহনতকারীদের শোষণ না করলে মালিক শ্রেণীর মালিক হিসেবে কোনো সত্তাই থাকে না। কিন্তু তাদের সামনে একটা দারুণ সমস্যা দেখা দেয়: একদিকে বিজ্ঞানকে হাতিয়ার হিসেবে মেনেছে বলেই মালিকশ্রেণী দিনের পর দিন মানুষের উৎপাদন শক্তিকে অবিশ্বাস্যভাবে বাড়িয়ে চলতে বাধ্য হয়, কলকারখানায় তৈরী হয় অনেক অনেক মালপত্তর। আবার অপর দিকে, দেশের লোককে শোষণ না করলে, অতএব গরীব করে রাখতে না পারলে, মুনাফা আসে না—অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই পণ্ড হয়ে যায়। অথচ দেশের লোক যদি গরীব লোক হয়ে থাকে তাহলে কলকারখানায় তৈরি এত মাল বেচা যাবে কার কাছে? তাই শেষ পর্যন্ত লড়াই লাগবার পথ ছাড়া মালিকরা আর কোন পথ খুঁজে পায় না। লড়াই লাগাতে পারলে লড়াইএর কাজে অমন পাহাড় প্রমাণ মালপত্রকে চড়া দরেই বিক্রি করা যাবে আর তাছাড়া লড়াইতে যদি জিত হয় তাহলে জয়-করা দেশে পাওয়া যাবে নতুন বাজারের সন্ধান। তাই মালিক শ্রেণীর যেটা চরম সংকট তার হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় মালিক শ্রেণী শেষ পর্যন্ত মাত্র একটা পথই খুঁজে পায়: যুদ্ধের পথ,—পৃথিবীতে শকুনের তাণ্ডব চলুক, সেই ফাঁকে নগদ কিছু লুঠে নেওয়া যাবে।

পৃথিবীতে প্রাচুর্য্য, স্বাস্থ্য আর শান্তি বলে জিনিস তাই মালিক শ্রেণীর কোষ্ঠিতে লেখা থাকতে পারে না। অথচ আজকের ধনতান্ত্রিক পৃথিবীতে বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক এই মালিক শ্রেণীরই কবলে থাকতে বাধ্য। তাই ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় বিজ্ঞানের অবস্থা আর বৈজ্ঞানিকের অবস্থা ঠিক কী রকম হয়ে দাঁড়াবার কথা তা আন্দাজ করা কঠিন নয়।

সামাজিক মেহনতের বিরাট পটভূমি থেকে বৈজ্ঞানিককে হটে আসতে হয়েছে; বিজ্ঞান আর সামাজিক মেহনতের মাঝখানে দেখা দিয়েছে মুনাফা লোভের কালো খাদ। শুধু তাই নয়, বৈজ্ঞানিক নিজে যে আবিষ্কার করবেন সেই আবিষ্কারের বাস্তব ফলাফলটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নিজে কিছুই আন্দাজ করতে পারেন না। আপনি যদি বৈজ্ঞানিক হন আর আপনি যদি আবিষ্কার করেন এক ধরনের নতুন বীজাণু তাহলেও আপনি হলফ করে বলতে পারবেন না এই আবিষ্কারের ফলটা আজ কোন্ পর্যন্ত গড়াবে। মানুষকে নিরোগ করবার পথ দেখাবে আপনার আবিষ্কার? না, মানুষকে ধ্বংস করবার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে আপনার আবিষ্কার? বৈজ্ঞানিক হিসেবে আপনি কিছুই বলতে পারবেন না। কেননা প্রশ্নের উত্তরটা নির্ভর করছে আপনার বৈজ্ঞানিক বোধের উপর নয়; মালিক শ্রেণীর হাল খাতার উপর। মালিকের দল আঁক কষবে। আঁক কষে তারা দেখবে এই আবিষ্কারের ভিত্তিতে নতুন কোন দাওয়াই বাজারে ছাড়লে কতখানি কাঁচা টাকা লুঠ করা যায়। এই আঁকটুকু একদিক থেকে আপনার আবিষ্কারের বাস্তব পরিধি বেঁধে দেবে। আর একদিক থেকে আপনার আবিষ্কারের বাস্তব পরিধি আঁটবে অন্য এক হিসেবে: লড়াইএর কাজে আপনার এই আবিষ্কারকে কতখানি কাজে লাগানো যায়? আপনি যে বীজাণু আবিষ্কার করেছেন সেই বীজাণু যদি যথেষ্ট মারাত্মক হয় তাহলে হয়তো মালিকদের ফরমাস শুনবেন এই বীজাণুর ঢালাও চাষ দিতে; শত্রু শিবিরে পাঠানো হবে এই অদৃশ্য মানব শত্রুদের, আপনার আবিষ্কারই লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বয়ং যমরাজের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবে। এই

অবস্থায় বৈজ্ঞানিক হিসেবে আপনি আপনার বিবেককে টিঁকিয়ে রাখবেন কিসের ভরসায়? কোন্ সান্ত্বনার উপর নির্ভর করে? আপনি যদি জোলিও কুরীর মত সমাজ-সচেতন হন, যদি আওয়াজ তোলেন এই ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপনার চাকরি যাবে। আপনি যত বড় বৈজ্ঞানিকই হোন না কেন, যদি মুখ বুঁজে মালিকশ্রেণীর গোলামী করতে রাজী না হন, কিম্বা চোখ বুঁজে মালিক শ্রেণীর বিভৎস লীলারঙ্গ সহ্য করতে রাজী না হন, তাহলে পুঁজিবাদী পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক হিসেবে আপনার কোন স্থান নেই। চোখ বুঁজে থাকাটাই অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের কাছে আজ মন্দের ভালো পথ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। আর তাই নিজেদের তাঁরা এই বলে শান্ত রাখতে চান যে বিজ্ঞানের পথ হল বিশুদ্ধ গবেষণার পথ। বৈজ্ঞানিক হবেন জ্ঞানবিভোর তন্ময় এক মানুষ, গবেষণাগারের নির্লিপ্ত আবহাওয়ায় তাঁর দিন কাটবে বিশ্বের রহস্য অনুসন্ধানে। কিন্তু তাঁর গবেষণার বাস্তব ফলাফল কী হবে-না-হবে, কোন্ পথে নিযুক্ত হবে তাঁর আবিষ্কার, এ সব প্রশ্নের জবাবদিহি বৈজ্ঞানিকের নয়। প্রয়োগ-জীবনের দায়িত্ব নয়। তাই প্রয়োগ-জীবনে যদিই বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার আয়োজন হয় তাহলেও বৈজ্ঞানিক নাচার।

আজকের পদার্থ-বিজ্ঞানের কথাটাই ধরা যাক না। পরমাণুকে ভেঙে পরমাণুর মধ্যে লুকোনো অবিশ্বাস্য বিশাল দৈত্যশক্তিকে বের করে আনবার পথ আবিষ্কার করেছেন বৈজ্ঞানিক। এই দৈত্যশক্তিকে যদি প্রগতি আর প্রাচুর্যের পথে নিয়োগ করা হয় তাহলে মানব সভ্যতা উন্নতির কোন্ হিমাদ্রি-শিখরে যে পৌঁছবে তা কল্পনা করাই আজ আমাদের পক্ষে কঠিন। বৈজ্ঞানিকের এক আশ্চর্যতম আবিষ্কার।

কিন্তু এই আবিষ্কারটি সম্বন্ধেই দাঙ্গাবাজ মালিক শ্রেণীর ফরমাসটা কী ? প্রতিদিনই দৈনিক পত্রিকায় সেই ফরমাসের বীভৎসতম রূপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ; সে ফরমাস হল চোখের নিমেষে পৃথিবীর বুক থেকে লক্ষ নরনারীকে লোপাট করে দেবার ফরমাস, করাল মৃত্যুর তুফান তোলবার ফরমাস। যে শক্তির সাহায্যে পাহাড় ভেঙে মরুভূমির বুকে প্রাচুর্যময়ী সভ্যতা গড়া সম্ভব সেই শক্তিকেই আজ নিয়োগ করবার ফরমাস হয়েছে সভ্যতার চিহ্ন মুছে দিয়ে পৃথিবীর বুকে মরুভূমি গড়বার। আশ্চর্যতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নির্মমতম বাস্তব পরাজয়। এই পরাজয়ের দায়িত্ব বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই নিতে চাইবেন না। তাই তাঁর বিবেককে বাঁচাবার একমাত্র পথ হল বাস্তব প্রয়োগের দায়িত্বটা অস্বীকার করা : নিছক জ্ঞানের চর্চা করাই তাঁর কাজ, প্রয়োগ-জীবনের দায়িত্ব তাঁর দায়িত্ব নয়।

পুরো ব্যাপারটা আর একবার ছোট করে ভেবে দেখা যাক। বুর্জোয়া যুগের যখন শুরু তখন বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক মেহনতের, বাস্তব প্রয়োগ-জীবনের, সম্পর্কটা ছিল ঘনিষ্ঠ। কেননা, বিজ্ঞান যে বুর্জোয়া শ্রেণীর কবলে সেই বুর্জোয়া শ্রেণী তখনকার দিনের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক বিপ্লবের অগ্রদূত, জনগণ তখন তার সহায়। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল এই বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈপ্লবিক অবদান, প্রকট রূপে প্রকাশ পেতে লাগল তার নির্লজ্জতম মুনাফালোভ। ধনতন্ত্রের যুগ যতদিন না শেষ হয় ততদিন বিজ্ঞান তারই কবলে আর বৈজ্ঞানিকের উপর তার যে ফরমাস সেই ফরমাসের দায় চোকাতে গিয়ে দিনের পর দিন বৈজ্ঞানিক নিজেকে গবেষণাগারের গণ্ডিটুকুর মধ্যে গুটিয়ে নিতে বাধ্য। গবেষণাগারের সংকীর্ণ গণ্ডির

মধ্যে যতটুকু প্রয়োগ-জীবন ততটুকুর নির্ভরও যদি বৈজ্ঞানিকের না জুটতো তাহলে আর বিজ্ঞান বলে কোন কিছুই সম্ভব হত না। কেননা, বিজ্ঞান একান্তভাবেই প্রয়োগ নির্ভর। কিন্তু সামাজিক প্রয়োগের বিশাল পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সামাজিক প্রয়োগের দায়িত্বটা বিবেকের খাতিরে অস্বীকার করতে গিয়ে, সামাজিক মেহনতের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অপপ্রয়োগটা ভুলে থাকবার আশায়, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে দরকার পড়ল এক রকম মোহমাদকতার। তন্ময় জ্ঞান-বিভোর বিশ্বরহস্য অনুসন্ধানী হবার মোহমাদকতা, গবেষণাগারের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে যেটুকু প্রয়োগের অবশেষ, আসলে যেটুকু বিজ্ঞানের প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত রেখেছে, সেটুকু রইল অন্তরীক্ষে, বৈজ্ঞানিক নিজেকে নির্লিপ্ত জ্ঞানসেবী বলে ভোলাতে চাইলেন। শুধু তাই নয়, সামাজিক মেহনতের সঙ্গে আত্মীয়তা ঘুচে যাবার দরুন, প্রয়োগ-জীবনকে বাদ দিয়ে নির্লিপ্ত জ্ঞান চর্চার আদর্শকে একমাত্র আদর্শ বলে মানবার চেষ্টা করবার দরুন, বিজ্ঞানের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল হরেক রকম ভাববাদ আর রহস্যবাদ। দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় ভাববাদ আর রহস্যবাদের আসল ভিত্তি হল জ্ঞান আর কর্মের মধ্যে, মতবাদ আর প্রয়োগ-জীবনের মধ্যে, বিচ্ছেদ। তাই বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক মেহনতের যতদিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ততদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আপসহীন বস্তুবাদ। বিজ্ঞান যতই বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিক ঘেঁষতে লাগল ততই বিজ্ঞানের মধ্যে জন্মাতে শুরু করল ভাববাদ আর রহস্যবাদের আগাছা। মেহনত বা প্রয়োগের সুস্থ আবহাওয়ায় বাস্তব দুনিয়াকে উড়িয়ে দিয়ে ভাববাদী কল্পনায় বিভোর হওয়ার কথাই ওঠে না। কথাটা ওঠে মেহনতকে পিছনে

ফেলে বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিকে ঘেঁষবার চেষ্টা দেখা দেবার পর। হালে যেমন ঘটেছে। বিজ্ঞানের মধ্যে রহস্যবাদ আর ভাববাদ যে মাথা তুলে দাঁড়াল তার কারণ হিসেবে আরো দুটো কথার উল্লেখ করা দরকার। বৈজ্ঞানিকের কথাটা ভেবে দেখুন। তাঁর সামনে একদিকে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর একদিকে এই গবেষণার বাস্তব ফলাফল। মাঝখানে কিসের এক অদৃশ্য শক্তি, যে-শক্তির ফলে তাঁর গবেষণার আসল-উদ্দেশ্যটা বাস্তব প্রয়োগের বেলায় বিপরীতে পর্যবসিত হয়। অর্থনীতি, রাজনীতি আর সমাজ-চেতনার আলোয় এই অদৃশ্য শক্তিকে চিনতে গেলে চাকরি যাবার ভয়, ভয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমস্ত সুযোগ সুবিধেটুকু থেকে বঞ্চিত হবার। তাই অদৃশ্য শক্তি বলে একে মেনে নেওয়াটাই হল নিরুপদ্রপ জীবন যাপন করবার একমাত্র পথ। জীবনে যদি এই অদৃশ্য শক্তির প্রভাবকে মেনে নিতে হয় তাহলে জীবনদর্শনেও তার ছায়াপাত হবেই। ফলে, বৈজ্ঞানিকের জীবনদর্শনে রহস্যবাদ আর ভাববাদের প্রভাব। এদিকে, মালিক শ্রেণী তাতে বিলক্ষণ খুশি ; কেননা এই রহস্যবাদ আর ভাববাদের কথাটা জনগণের মনকে যথেষ্ট ভাবে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারলে জনজাগরণের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আর ভাড়াটে প্রচারকদের মুখে এই রহস্যবাদ আর ভাববাদের কথাটা যতখানি না কার্যকরী তার চেয়ে ঢের বেশী কার্যকরী হয় বৈজ্ঞানিকদের মুখ দিয়ে প্রচারিত হলে। ফলে, বৈজ্ঞানিকের মুখে যত ভাববাদ, যত রহস্যবাদ, তত নগদ বিদায়ের বন্দোবস্ত। এর চরম নমুনা বার্টরাণ্ড রাসেল। বিজ্ঞানের নামে ভাববাদের পসারী হয়ে লক্ষ্য মুদ্রার পুরস্কার তাঁর কপালে জুটল। এদিকে, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ভাববাদ আর রহস্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামটা ক্ষমাই নয়, তার সামনে

রাজদণ্ডের শাসন। নমুনা হিসেবে জোলিও কুরীর নামটাই আবার উল্লেখ করা যায়।

এই তো গেল বৈজ্ঞানিকের কথা আর বিজ্ঞানের কথা। এইবার জনগণের কথা আর জনগণের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্কর কথা ভেবে দেখা যাক। আজকের ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় মালিক শ্রেণীর দাবি হল জনগণ শুধু মুখ বুঁজে খাটবে, মাথা ঘামাবে না, চিন্তা করবে না। কেননা জনগণের মনে প্রশ্ন জাগাটা প্রভুদের পক্ষে নেহাৎই অস্বস্তিকর এক ব্যাপার। "ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় এটা নিশ্চয়ই অবাঞ্ছনীয় যে কড়া-পড়া হাত নিয়ে যারা মেহনত করছে তারা চিন্তা করবে ; কেননা, তারা যদি চিন্তা করতে শুরু করে তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে ধনতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক ঝেঁটিয়ে ফেলে নতুন সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার।" (১) জনগণকে মূক মেহনতকারী করে রাখবার তাগিদটা এমন কিছু নতুন নয়, সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার সময় থেকেই এই কথা। তখন থেকেই মাথা ঘামাবার দায় আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলবার দায় আলাদা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজকের দিনে ধনতন্ত্রের এই মুমূর্ষু দশায়, যেটা বিশেষ করে উল্লেখ করবার মত কথা সেটা হল বিজ্ঞানকে নিছক মাথা ঘামানোর কোঠায় ঠেলে দেওয়া, তাই মেহনতকারী জনতার সঙ্গে বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করা। কিছু দিন আগেও এমনটা ছিল না। কিছু দিন আগেও বিজ্ঞান পরিণত হয়নি বিশুদ্ধ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায়।

মোটের ওপর, আজকের দিনের ছবিটা দাঁড়িয়েছে : একদিকে জনগণ,— তারা ইতর জনতা, তারা কুলিমজুর আর চাষাভুষো, তারা গতর খাটাবে মুখ বুঁজে, মাথা না ঘামিয়ে। আর একদিকে বিজ্ঞান,—হরেক

রকম টেস্ট টিউব আর জটিল যন্ত্রপাতি দিয়ে ঘেরা গবেষণাগারের সংকীর্ণ গণ্ডীটুকুর মধ্যে বৈজ্ঞানিক তাঁর দুর্বোধ্য সংকেতময় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় তন্ময়। মাঝখানে অন্ধ, আপসহীন মুনাফালোভের কুয়াশা, সে-কুয়াশা ভেদ করে একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত নজর চলে না। তাই জনগণের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের মুখ দেখাদেখি নেই, বিজ্ঞানের সঙ্গে নেই সামাজিক মেহনতের সম্পর্ক। সাধারণের চোখে বৈজ্ঞানিক হল এক জটিল রহস্যলোকের তন্ময় আর আধ-পাগলা নায়ক, রক্তমাংস আর হৃদয় দিয়ে গড়া মাটির পৃথিবীর মানুষ ঠিক নয়, এক কথায় যেন এক আজব জীব। তাই সাধারণ কর্মঠ মানুষের সঙ্গে তার মিল কম : তার বেশভূষা অন্য রকমের, তার পটভূমি অন্য রকমের, অন্যদিকে আবদ্ধ তার দৃষ্টি। আমরা যে সমাজে বেঁচে আছি,—কিম্বা রাজনৈতিক দিক থেকে আর একটু নিখুঁতভাবে বললে বলা দরকার, যে-সমাজ থেকে রপ্তানি করা বোল-বুলি দিয়ে আমাদের শিশুশিক্ষা,—সে-সমাজ বৈজ্ঞানিককে দেখতে শিখিয়েছে এই রকম চোখে।

আর সেই জন্যেই লাইসেনকোর ছবিটা দেখে আমাদের খটকা লাগে। মনে হয় বৈজ্ঞানিক কোথায় ওই ছবির মধ্যে? কোথায় সেই তন্ময় আধ-পাগলা বিজ্ঞানপুরীর নায়ক, যার দিন কাটবার কথা দুর্বোধ্য সংকেত আর জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে? লাইসেনকোর ওই ছবির মধ্যে বৈজ্ঞানিককে আমরা যে খুঁজে পাই না তার আসল কারণটুকুর কথা আমাদের মনে থাকে না, মনে থাকে না ও সমাজ অন্য রকমের সমাজ হয়ে গিয়েছে আর তাই বদলে গিয়েছে ওই সমাজে বৈজ্ঞানিকের রূপটা। সমাজতন্ত্র। তার মানে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর

আর ব্যক্তিগত মালিকের মালিকানা নয়। আর তা নয় বলেই, মুনাফালোভের চোরা পাহাড়ে ধাক্কা লেগে চিড় হয়ে যায় না সব কিছু। মালিকশ্রেণী নেই, অন্ধ মুনাফা অন্বেষী নেই,—বিজ্ঞান নয় মুনাফালোভের হাতিয়ার মাত্র। উৎপাদনের উদ্দেশ্যটা হল সমাজের প্রয়োজন মেটানো, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যে উৎপাদন। আর বিজ্ঞান এই উৎপাদনেরই হাতিয়ার। তাই জনসাধারণের সঙ্গে, সামাজিক মেহনতের সঙ্গে, বিজ্ঞানের সেই পুরনো সম্পর্ক, ভেঙ্গে যাওয়া সৌহার্দ্য নতুন করে ফিরে পাওয়া। এর প্রকাশ লাইসেনকোর ওই ছবিতে : বেশভুষায়, মাথার টুপিতে, পটভূমিতে, দৃষ্টির দিক নির্ণয়ে। অবশ্য এই প্রকাশগুলিই প্রমাণ নয়। বৈজ্ঞানিককে যদি ওই রকম সাজে সাজিয়ে ওই পটভূমিতে দাঁড় করানো যায় তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে না সমাজে জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের, বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক মেহনতের, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে জনগণের, হারানো সন্ধি ফিরে এসেছে। তবু ওই ছবির মধ্যে প্রকাশ রয়েছে এই কথার। আর সেই প্রকাশটুকুকেই মূলসূত্র হিসেবে ধরে লাইসেনকোর আবিষ্কারকে বোঝবার কথা বলছি।

কিন্তু প্রমাণ? প্রমাণও আছে। প্রমাণগুলোর কথা একে একে ধরা যাক।

প্রথমত, খবরের কাগজে খবর দেবার ঘটাটা দেখা যাক। বৈজ্ঞানিকে-বৈজ্ঞানিকে তর্ক হচ্ছে। বিজ্ঞানের কঠিন বিষয় নিয়ে তর্ক। কিন্তু দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক কাগজে সেই তর্কের কথাটা খুঁটিয়ে প্রকাশ করা—এটা কি আমাদের পক্ষে বা ইঙ্গ-মার্কিনদের দেশের পক্ষে ভাবা যায়? কিন্তু সোভিয়েট দেশে অন্য রকম। খুঁটিয়ে, ঘটা করে,

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই মতবিরোধের খবরটা ছাপিয়ে যাওয়া : দিনের পর দিন, সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিকে। তার মানে ? সোজা কথায় তার মানে হল জনসাধারণের কাছে এ তর্ক অত্যন্ত জরুরী তর্ক, তাদের নিজেদের জ্ঞানের দিক থেকে জরুরী, এই তর্কের ব্যাপারে তাই শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিকদের কোন কূট আর ব্যক্তিগত অধিকার নয়। বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে তর্ক, কিন্তু সেই তর্কের জের খবরের কাগজ হয়ে দেশের জনগণের মধ্যে, বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিতে, জীবন্ত আলোচনা হয়ে উঠেছে। ৪ঠা অগস্ট থেকে ১১ই অগস্ট পর্যন্ত 'প্রাভ্দা' কাগজের অর্ধেকেরও বেশী জায়গা জুড়ে এই বৈজ্ঞানিক বিতর্কের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এ কথা ভাবতে পারি না। কেননা, আমাদের ধারনায় বিজ্ঞান নেহাৎই বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার, তাই ও-নিয়ে মাথা ঘামাতে যাওয়া আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে অনধিকার চর্চা। কিন্তু সোভিয়েটের ওরা সে-কথা মানবে না। ওরা জানে বিজ্ঞান বলে জিনিষ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, পৃথিবীকে জয় করে মানুষের জন্যে প্রাচুর্য ডেকে আনাই হল বিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য, তাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে না হচ্ছে এ-খবর জনসাধারণের পক্ষে জানা একান্তই দরকার। ওদের দেশের বৈজ্ঞানিক তাই বলেন : "(সোভিয়েট বিজ্ঞান) মতবাদগত এবং অমূর্ত চিন্তার সঙ্গে প্রয়োগের —কলাকৌশলের—এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বজায় রাখে। ···যতো অমূর্ত সমস্যা নিয়েই বৈজ্ঞানিক ব্যস্ত থাকুন না কেন, তিনি সবসময়েই মনে রাখেন যে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল সমাজের কাজে লাগা এবং নিজের আয়ত্বে যে-কটি উপায় আছে সবগুলির সাহায্যে তিনি চেষ্টা করেন আপন-ফলাফলের সঙ্গে প্রয়োগের যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি একটি

যোগসূত্র স্থাপন করার।" (২) তাই বিদেশী বৈজ্ঞানিক সোভিয়েট দেশ পর্যটনের পর বলেন: "অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিপূর্ণতার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার উৎসাহ এবং দায়িত্ব গ্রহণ করে ইউ.এস্.এস্.আর.-এর এ্যাকাডেমী অফ্ সায়েন্সেস্।" (৩)

এই সামাজিক পটভূমির কথা মনে রাখতে হবে। বিজ্ঞানের সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যোগাযোগ—অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে ব্যাপারটা আসলে তো আর কিছুই নয়, দেশের লোকদের জন্যে কতটা কী দরকার আর সেই দরকার মত জিনিস কেমন ভাবে তৈরী করা যায় তারই হিসেব-নিকেশ। সমাজের পটভূমি যদি তাই হয়, বিজ্ঞান যদি বিশুদ্ধ রহস্য সন্ধানের মোহ ছেড়ে অগ্রণী হয় জনসাধারণের বাস্তব অভাব মেটাবার কাজে, তাহলে কৃষি-বিজ্ঞানের—তথা জীববিজ্ঞানের—গবেষণা নিয়ে সোভিয়েট দেশে যে-রকম ব্যবস্থা হয়েছে সেই রকম ব্যবস্থা না হয়ে আর উপায় কি? ব্যবস্থাটা ঠিক কী রকম হয়েছে তার স্পষ্ট পরিচয় দেওয়া যাক।

লাইসেনকো আর তার বিরোধী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদটা নতুন নয়। ১৯৩৭-এ লাইসেনকোর সঙ্গে এস. আই. ভ্যাভিলভের জীব-বিজ্ঞান নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল. সেই বিতর্কে লাইসেনকোর জিত হয়েছিল বলেই তিনি এ্যাকাডেমির সভ্যপদ পেয়েছিলেন এবং তাঁর গবেষণা যাতে আরো ভালো করে চালানো সম্ভব হয় এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের তরফ থেকে প্রচুর অর্থব্যায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লাইসেনকো হলেন জীববিজ্ঞানে মিচুরিন্-পন্থী, যে মতবাদের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব সেই মতবাদকে সাবেকী জীববিজ্ঞান বলে উল্লেখ করা যাক। মিচুরিন্‌বাদের সঙ্গে এই সাবেকী মতবাদের তফাৎগুলোর কথা পরে তুলবো। আপাতত

সোভিয়েট রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা। রাষ্ট্রের তরফ থেকে উভয় মতবাদীদেরই গবেষণার জন্যে প্রচুর অর্থ সাহায্য করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এবং কয়েক বছর অপেক্ষা করবার পর দেখা গেল সাবেকী মতবাদীরা খাদ্য উৎপাদনের আঙ্গিকে বড় একটা দরকারী অবদান করতে পারেন নি, মিচুরিন্‌পন্থীদের অবদানটা অসামান্য। কিন্তু তবু তাড়াহুড়োয় কোন ব্যবস্থা করা নয়। জীববিজ্ঞানীদের সভা ডাকা হল, বিশেষজ্ঞেরা দেশ ঘুরে আবাদ পরীক্ষা করলেন, সাক্ষী দিলেন যৌথ খামারের কর্মীরা,—কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়ে কী রকম ফল পাওয়া গিয়েছে। ফলের দিক থেকে তফাৎটা অবিশ্বাস্য : মিচুরিন্ পদ্ধতিতে যে-ফসল পাওয়া গেল তাকে সাধারণ ফসল বলে চিনতেই অসুবিধে হয়—এত পুষ্ট, এত আশ্চর্য। মিচুরিন পদ্ধতিতে যে-সব অজন্মা জমিতে এত সোনালী ফসলের বন্যা সেই সব জমিকে আগেকার সবাই সনাতন মরুভূমি বা তুষারদেশ বলেই চিনতে চেয়েছিল। এই রকম, অনেক আশ্চর্য ফল। আর, এই কথাগুলো প্রকাশ্যে আলোচনা হবার পর, প্রমাণিত হবার পর, স্বীকৃত হবার পর, লাইসেনকোকে ওরা অভিনন্দন জানালো জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবে. সাবেকী মতবাদ অনুসারে গবেষণা করবার জন্যে যে-টাকার বরাদ্দ ছিল সে-টাকার অঙ্ক কমিয়ে মিচুরিন পদ্ধতি অনুসারে গবেষণার তহবিলে দেওয়া হল অনেক বেশী টাকা। অবশ্যই মনে রাখতে হবে সাবেকী পথে গবেষণার জন্যে আজো সোভিয়েট দেশে যে-টাকা বরাদ্দ তার পরিমাণ পুরো ফরাসী দেশে জীববিদ্যার জন্যে পুরো বরাদ্দ টাকার চেয়ে ঢের বেশী (৪)। তাছাড়া, লাইসেনকোর প্রবলতম বিরোধী-দের মধ্যে আজো অনেকেই বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের পদ হারান নি।

"এই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে যে লাইসেনকোর প্রবলতম বিরোধীদের মধ্যে এ্যাকাডেমিসিয়ান্ অরবেলী আজো অমন গুরুত্বপূর্ণ 'প্যাভ্লভ্ ইন্‌সিটিউট অফ্ ফিসিওলজী'র পরিচালক থেকে গিয়েছেন,'টিমিরিয়াজেভ্ এ্যাকাডেমী অফ্ এগ্‌রিকাল্‌চারে'র পরিচালক থেকে গিয়েছেন এ্যাকাডেমিসিয়ান্ বি. জভোডভ্‌স্কি, এবং ওই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানেই অধ্যাপক নেম্‌চিনভ্ এবং জন্‌কভ্‌স্কি-র আসন অক্ষুণ্ণ রয়েছে।" (৫) কথাগুলো বিশেষ করে উল্লেখ করতে হল এই কারণে যে সোভিয়েট দেশে বিজ্ঞানের ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিয়ে অনেক রকম কুৎসা রটানো হয়েছে এবং এই সব কুৎসাগুলো কুৎসাই। আসলে সোভিয়েট রাষ্ট্র হল জনগণের রাষ্ট্র, সেখানে কোনো বিজ্ঞানী বিশেষের বিরুদ্ধে অহেতুক শাস্তির কথা যে-রকম ওঠেই না সেই রকমই যে-বিজ্ঞান জনকল্যাণের কাজে নিজেকে সার্থক বলে প্রমাণ করেছে সেই বিজ্ঞান রাষ্ট্রের কাছ থেকেও অনেক বেশী উৎসাহ পেতে বাধ্য।

কুৎসার কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু কুৎসা করতে গিয়ে ভুল করে সত্যের উপর হোঁচট খাবার দৃষ্টান্তটা চিত্তাকর্ষক। সোভিয়েট বিরোধী পেশাদার প্রচারকরা গলা ছেড়ে বলছেন : লাইসেনকো লোকটা আসলে বৈজ্ঞানিকই নয়, চাষামাত্র।

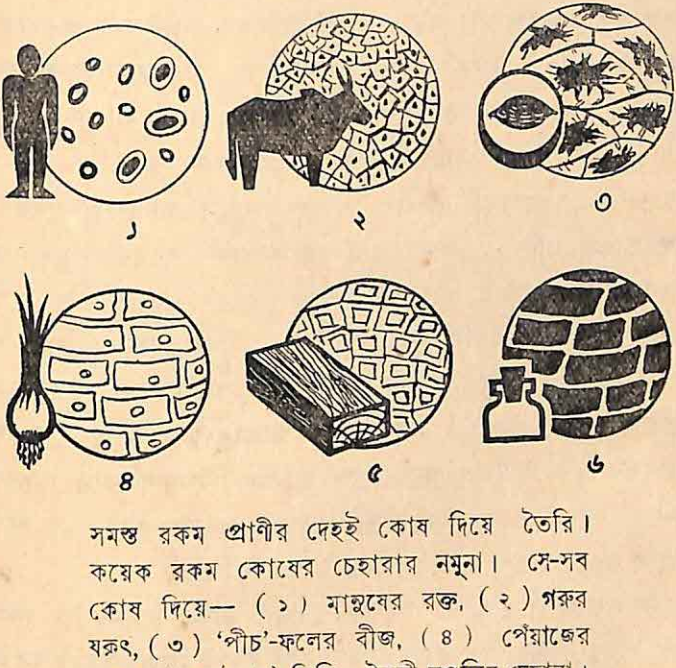
নিশ্চয়ই চাষা। ওদেশের যৌথকৃষির ক্ষেত্রে তাঁর জুড়িদার সংগঠক কমই আছেন। তবুও বৈজ্ঞানিক। সেই জন্যেই সত্যি মহৎ বৈজ্ঞানিক। কেননা তাঁর গবেষণা শুধু মুষ্টিমেয় মালিককে মুনাফা জোগাবার কাজে নিঃশেষ নয়, তাঁর গবেষণা মরুভূমিতে শ্যামল শস্যের বন্যা আনছে, দেশের লোকের ঘরে তুলছে প্রাচুর্য।

২

জীববিজ্ঞানের সাবেকী মতবাদ বলতে ঠিক কী বোঝায়? মিচুরিন আর লাইসেনকোর সঙ্গে তার তফাৎটাই বা ঠিক কোথায়? মিচুরিন-বাদ বা লাইসেনকো-বাদের মূল কথাগুলো ঠিক কী কী? এই সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সে-আলোচনা করতে হলে প্রথমে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসের একটা মোটামুটি খসড়া করে নেওয়া দরকার। বস্তুত, লাইসেনকো নিজেও তাঁর মতবাদ পেশ করবার সময় শুরুতে এই রকমের একটা খসড়া করে নিয়েছিলেন। এই খসড়ায় বিশেষ করে কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা দরকার। স্লিডেন্ আর স্‌ভান; ডারউইন আর লেমার্ক; মেণ্ডেল, ভাইসম্যান্ আর মর্গান।

স্লিডেন্ আর স্‌ভান দুজনেই ছিলেন জার্মান বৈজ্ঞানিক। ১৮৩৮-এ স্লিডেন্ আবিষ্কার করলেন: সব রকম উদ্ভিদের সব রকম অঙ্গের মূলে আছে এক অতি সূক্ষ্ম অংশ। এই ধরনের সূক্ষ্ম অংশের নাম দেওয়া হল 'সেল' বা কোষ। ১৮৩৯-এ স্লিডেনের এই আবিষ্কারকে আরো এক-পা এগিয়ে নিয়ে গেলেন স্‌ভান্। তিনি দেখালেন, শুধু উদ্ভিদের

শরীর কেন পৃথিবীর সমস্ত রকম প্রাণী দেহই এই কোষ নামের সূক্ষ্মতম অংশ দিয়ে গড়া : দূর্বা ঘাসের ডগাটুকু থেকে শুরু করে হরিণের সিং পর্যন্ত সব কিছুর মূলে রয়েছে কোষ বা সেল। সমস্ত মাটির বাসনই



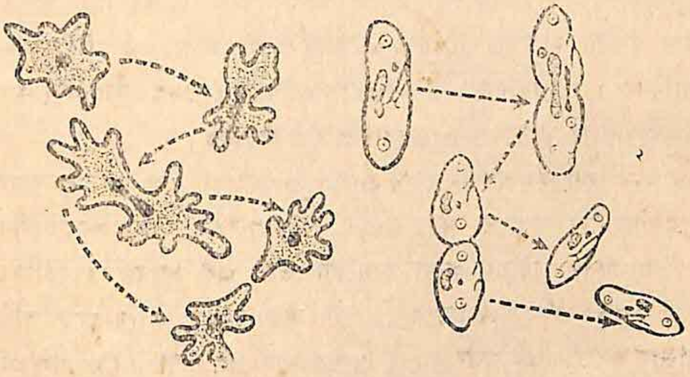
সমস্ত রকম প্রাণীর দেহই কোষ দিয়ে তৈরি। কয়েক রকম কোষের চেহারার নমুনা। সে-সব কোষ দিয়ে— (১) মানুষের রক্ত, (২) গরুর যকৃৎ, (৩) 'পীচ'-ফলের বীজ, (৪) পেঁয়াজের ছাল, (৫) কাঠ, (৬) ছিপি –তৈরী সগুলির চেহারা।

যে-রকম শেষ পর্যন্ত মাটির কণা দিয়ে তৈরি সেই রকম সমস্ত জীব-দেহই কোষ দিয়ে গড়া। তবে কোষ এক রকমের নয়, নানান রকমের। অনেকগুলি একজাতীয় কোষ একই মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে

যেন এক একটা দল পাকায় ; এই দলগুলির নাম দেওয়া হয় 'কলা' বা টিস্থ। আবার অনেকগুলি 'কলা' বা টিস্থ মিলে গড়ে তোলে এক একটি অঙ্গ। আবার অনেকগুলি অঙ্গ মিলে এক একটি তন্ত্র। ধরা যাক, আমাদের শরীরের কথা। আমাদের শরীরকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি তন্ত্র পাওয়া যাবে : রক্তচলাচলতন্ত্র, পচনতন্ত্র, জননতন্ত্র, এই রকম নানান রকম। রক্ত চলাচলতন্ত্রের দরুন আমাদের শরীরে সর্বত্র সব সময় রক্ত চলাচল করে। পচনতন্ত্রের দরুন আমরা খাবার দাবার হজম করতে পারি। জননতন্ত্রের দরুন জন্ম দিতে পারি সন্তানের। প্রত্যেকটি তন্ত্রকে বিশ্লেষণ করলে প্রথমটায় কয়েকটি অঙ্গ পাওয়া যাবে ; যেমন ধরুন, রক্ত চলাচলতন্ত্রের বেলায় হৃদপিণ্ড নামের অঙ্গ। আবার, প্রত্যেকটি অঙ্গকে বিশ্লেষণ করলে তার মূলে পাওয়া যাবে কতকগুলি কলা বা টিস্থ। বিশ্লেষণের কাজকে যদি আরো কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে দেখতে পাবেন প্রত্যেকটি টিস্থ তৈরী হয়েছে অনেক অজস্র কোষ দিয়ে। অবশ্য কোষগুলি এত ছোট যে শুধু চোখে আলাদা আলাদা করে তাদের দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অনেক বড় করে দেখলে তবেই তাদের দেখতে পাওয়া যায়।

মাটির বাসনের সঙ্গে তুলনা করেছি। সমস্ত মাটির বাসনই যে-রকম শেষ পর্যন্ত মাটির কণা দিয়ে তৈরি সেই রকমই সমস্ত জীবদেহ তৈরী কোষ দিয়ে। তবু এই উপমাকে নিছক উপমা হিসাবেই বুঝতে হবে। কেননা কোষদের বেলায় নতুন কথা আছে। প্রতিটি মাটির কণাকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখলে সেগুলিকে আর মাটির বাসন বলা তো চলে না ; তার মানে মাটির বাসনের মধ্যে যে-সব লক্ষণ আছে মাটির

কণার মধ্যে সেই সব লক্ষণ নেই। কিন্তু কোষদের বেলায় অন্য কথা। জীবদেহের যেগুলি মূল লক্ষণ প্রত্যেকটি কোষের মধ্যেও সেই সব লক্ষণ বর্তমান রয়েছে : প্রতিটি কোষ নিজের শরীরের বাইরে থেকে খাবার সংগ্রহ করে, সেই খাবারে পুষ্ট হয় তার দেহ খাবারের মধ্যে যেটুকু জিনিস নিজের শরীরের কাজে লাগে না সেইটুকুকে পরিত্যাগও



একটি কোষ থেকে দুটি কোষের জন্ম।
তীর চিহ্নগুলি অনুসরণ করে দেখুন।

করে, প্রতিটি কোষ জন্ম দেয় নতুন কোষের। এইভাবে, জীবদেহের যেগুলি মূল লক্ষণ প্রতিটি কোষের মধ্যেও সেই সব লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

কোষের কথা খুঁটিয়ে মনে রাখা দরকার। তার কারণ শুধু এই নয় যে লাইসেনকোর সঙ্গে সাবেকী জীববিজ্ঞানের তফাৎটা বোঝবার সময়

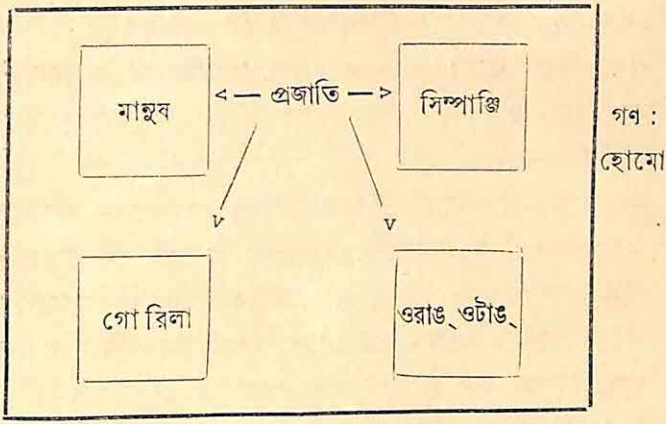
কোষ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার দরকার পড়বে। আসলে, কোষ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা বাদ দিয়ে জীববিজ্ঞানের কোন কথাই বুঝতে পারা সম্ভব নয়। এ-কথা নিশ্চয়ই খুব জোর করে বলা চলে যে কোষ আবিষ্কার থেকেই জীববিজ্ঞানের জন্ম। শুধু তাই নয়; এঙ্গেল্‌স্ দেখিয়েছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর যে তিনটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দরুন মানুষের সামনে বাস্তব জ্ঞানের, - প্রকৃত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির,—পথ খুলে গেল সেই তিনটি আবিষ্কারের মধ্যে একটি হল স্লিডেন্ আব স্‌ভান-এর এই আবিষ্কার। আর একটি আবিষ্কার হিসেবে এঙ্গেল্‌স্ উল্লেখ করেছেন ডারউইন্-এর আবিষ্কার। জীববিজ্ঞানের ইতিহাসের দিক থেকেও ডারউইন্-এর এই আবিষ্কার নিঃসন্দেহে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছে।

১৮৫৯-এ ডারউইন্ তাঁর মতবাদ প্রকাশ করলেন। দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে একটানা গবেষণা করে তিনি যে মাল-মশলা সংগ্রহ করেছিলেন সেই মালমশলা দিয়েই গাঁথা হয়েছিল তাঁর এই মতবাদের ভিত্তি। সেই জন্যেই তাঁর মতবাদের ভিত্তিটা অমন মজবুত। যে-গ্রন্থে তিনি প্রকাশ করলেন এই মতবাদ সেই গ্রন্থের নাম হল: The Origin of Species by Natural Selection। বাংলা করলে নামটার মানে দাঁড়াবে: প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে প্রজাতির উৎস। পরিভাষার গাম্ভীর্যে নামটা বড় বেশী গুরু গম্ভীর শোনালো। তবু এই নামটুকুকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে। কেননা, এই নামটুকুর মধ্যে ডারউইন-বাদের মূল কথাগুলির সন্ধান পাওয়া সম্ভব। প্রথমত প্রজাতি বা species কথাটার মানে কী? আসলে, পৃথিবীতে আমরা নানান রকম প্রাণী দেখতে পাই। এত রকমের, যে সবগুলির নামের একটা ফর্দ করে গেলেই প্রায় ছোটখাটো মহাভারত রচনা করা দরকার হয়ে

পড়ে। বৈজ্ঞানিকের পক্ষে তাই প্রথম প্রয়োজন প্রাণীগুলির একটা শ্রেণীবিভাগ করে নেওয়া। জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঠিক কী রকম শ্রেণীবিভাগ করা হয় তার পুরো পরিচয় দিতে গেলে অনেকখানি জায়গা যাবে। আপাতত, একটা নমুনার সাহায্যে বিষয়টার কাঠামোটুকু উল্লেখ করা যাক। নেহাৎ খুচরো-খাচরা আর অস্থায়ী তফাতের দিক ছাড়া মৌলিক দিক থেকে যে-সব প্রাণীদের মধ্যে মিল রয়েছে সেই সব জীবকে একটি দলের অন্তর্গত করা হয়। যেমন ধরুন, চলতি কুকুর। চলতি কুকুর অবশ্য অনেক রকমের : ম্যাষ্টিক্, হাউণ্ড, স্প্যানিয়াল, পুড্‌ল্, এ্যাল্‌সেসিয়ান্, টেরিয়ার। কিন্তু এত যে রকমারি তার মূলে রয়েছে খুচরো খাচরা দিকের তফাৎ ; মৌলিক দিক থেকে সবগুলির মধ্যে মিল। তাই সবগুলিকে একটা দলের অন্তর্গত করা হয়। অবশ্য, আরো মৌলিক কতকগুলি লক্ষণের দিক থেকে এই দলটির সঙ্গে আরো কয়েকটি দলের প্রাণীর মিল আছে ; সেই সব দলের নাম হল কয়োটি (coyote : উত্তর আমেরিকার নেকড়ে), টিম্‌বার উল্‌ফ্ (আর এক রকমের নেক্‌ড়ে-বিশেষ)। তাহলে, চলতি কুকুর, কয়োটি, টিম্‌বার উল্‌ফ্—এই তিন রকম দলের প্রাণীকে আরো মৌলিক একটা দলের অন্তর্গত করা দরকার। জীববিজ্ঞানে এই দলের প্রাণীকে বলা হয় ক্যানিস্। অর্থাৎ সাদৃশ্যের দিক থেকে একটা ব্যাপকতর দল পাওয়া গেল যার মধ্যে আরো ছোট ছোট কয়েকটা দল। সংকীর্ণতর দলগুলির তুলনায় ব্যাপকতর দলটিকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হবে genus বা গণ, এবং ব্যাপকতর দলটির তুলনায় ছোট ছোট দলগুলির প্রত্যেকটিকে বলা হবে species বা প্রজাতি। একটি গণের অন্তর্গত একাধিক প্রজাতি।

অবশ্য, আরো মৌলিক মিলের দিক থেকে একাধিক গণ অন্তর্গত হবে ব্যাপকতম আর একটি দলের মধ্যে এবং এই ভাবে শ্রেণীবিভাগ করতে করতে এগিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত পৌছব ১৪টি মূল শ্রেণীর জীবে। কিন্তু আপাতত, এত দূরের আলোচনা তোলবার দরকার নেই। দরকার হল, প্রজাতি বা species কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারা। আর একটা নমুনা নেওয়া যাক। যেমন ধরুন, মানুষ। এমনিতে দেখতে গেলে, মানুষ অবশ্য হরেক রকমের। কারো চুল কোঁকড়া, কারো সোজা। কারো রং সাদা, কারো কালো। কিন্তু এই সব তফাৎগুলো এমন কিছু মৌলিক তফাৎ নয়, খুচরো খাচরার তফাৎ। তাই মৌলিক মিলের দিক থেকে বৈজ্ঞানিকেরা সমস্ত মানুষকেই একটি দলের অন্তর্গত করেন এবং বিজ্ঞানের পরিভাষার সেই দলটির নাম দেওয়া হয় Homo Sapiens বা হোমো সেপিয়ান্‌স। মানুষ বা হোমো সেপিয়ান নামের এই যে জীব-দল এর সঙ্গে কিন্তু আরো মৌলিক লক্ষণের দিক থেকে অন্য কয়েকটি দলের জীবদের মিল আছে; সেই সব জীবদের নাম দেওয়া হয় সিম্পাঞ্জি, গেরিলা, ওরাঙ্‌ ওটাঙ্‌। তাই, আরো ব্যাপক একটা দলের মধ্যে এই সমস্ত দলগুলিকে অন্তভুক্ত করা হয়। সেই ব্যাপকতর দলটির বৈজ্ঞানিক নাম Homo বা হোমো। তাহলে মানুষ, সিম্পাঞ্জি, ওরাঙ্‌ ওটাঙ্‌-এর তুলনায় হোমো হবে একটি গণ বা genus এবং হোমো নামের গণের তুলনায় মানুষ, সিম্পাঞ্জি ইত্যাদি হবে species বা প্রজাতি। একটা ছবি আঁকলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে : ৩৫ পৃষ্ঠার ছবিটা দেখুন। এইবার ডারউইনের সমস্যাটা ভালো করে বুঝতে পারা যাবে। ডারউইনের সমস্যা হল এই প্রজাতিগুলির উৎস নিয়ে সমস্যা।

পৃথিবীর বুকে কোথা থেকে, কেমন করে এল, এই প্রজাতিগুলি ? মনে রাখতে হবে, এই প্রশ্নটা তোলা মানেই এক দারুণ বিপ্লব ঘোষণা করা।



কেননা, তখনকার দিন পর্যন্ত যে-মতবাদটা প্রায় একেবারে একচেটিয়া মতবাদ হিসেবে স্বীকৃত হত সেই মতবাদটা হল ঈশ্বর এই সব ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতিকে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। এই মতবাদটার নাম হল : Theory of special creation—বিশিষ্ট সৃষ্টির মতবাদ। যেমন ধরুন, খ্রীষ্টানদের ধর্মপুঁথি। এই পুঁথির শুরুতেই সৃষ্টির উপাখ্যান লেখা আছে। সে উপাখ্যান অনুসারে ভগবান একবার বললেন, জন্ম হোক আলোর ; জন্ম হল আলোর। তারপর এই ভাবে ভগবানের ইচ্ছে অনুসারে দ্বিতীয় দিন সৃষ্টি হল আকাশ, সমুদ্র, পৃথিবী। তৃতীয় দিনে ভগবান বললেন, পৃথিবীর বুকে ঘাসের জন্ম হোক, লতাগুল্মের জন্ম হোক, জন্মাক ফলের গাছ। তৃতীয় দিনে সৃষ্টি হল নানান রকমের

ঘাস, বীজ, গাছ। চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হল সূর্য, চন্দ্র। পঞ্চম দিনে তাঁর ইচ্ছে অনুসারে সৃষ্টি হল জলের জীব, আকাশের পাখী—নানান রকম, প্রত্যেকে নিজের নিজের মত সন্তানের জন্ম দেবে। ষষ্ঠ দিনে সৃষ্টি হল সরীসৃপ আর নানান রকমের ডাঙার জীবজন্তু, তারা নিজেদের বংশ বাড়িয়ে চলবে। আর সপ্তম দিনে তিনি সৃষ্টি করলেন মানুষ, তাঁর চরম সৃষ্টি, তাঁর নিজের মত করে। খুশিতে ভরে উঠল ভগবানের মন।

এই তো খ্রীষ্টান ধর্মে সৃষ্টির উপাখ্যান। ভগবানের খেয়াল খুশির দিকটুকু বাদ দিলে এই উপাখ্যানের মধ্যে যে স্পষ্ট মতবাদটুকু বাকি থাকে সেই মতবাদ হল পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের জীব আলাদা ভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং সনাতন কাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে তাদেরই বংশ পরম্পরা চলেছে : এই বংশ পরম্পরাটি এমনই অবিচ্ছিন্ন যে এর মধ্যে নতুন কোন প্রাণীর আবির্ভাব হবার অবকাশ নেই। খ্রীষ্ট ধর্মের মূলে এই যে মতবাদ, সহস্র বছর ধরে ইওরোপীয় মনকে তা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এবং ডারউইনের প্রশ্ন—প্রজাতির উৎস সম্বন্ধে প্রশ্ন—দারুণ আঘাত হানলো এই মতবাদের মূলে। কেননা প্রশ্নটা তোলা মানেই অস্বীকার করা যে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী—অর্থাৎ, বিভিন্ন ধরণের প্রাণী—পৃথিবীর বুকে অবিচ্ছিন্ন বংশধারায় বসবাস করছে।

ডারউইন কেন এ প্রশ্ন তুললেন ? তার কারণ, দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে তাঁর ওই একটানা গবেষণা। এই গবেষণার ফলে তিনি স্পষ্টই দেখতে পেলেন যে গড়নের দিক থেকে আর ভ্রূণ অবস্থার দিক থেকে কতকগুলি স্বতন্ত্র প্রজাতির মধ্যে এমন মিল রয়েছে, পৃথিবীর বুকের উপর বিভিন্ন জায়গায় এই সব প্রজাতিগুলি এমন ভাবে ছড়ানো রয়েছে, ভূতত্ত্বের

আবিষ্কার অনুসারে দেখতে পাওয়া যায় এরা এমন ভাবে একের পর এক পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়েছে যে এদের সম্পূর্ণ সনাতন আর স্বতন্ত্র কতকগুলি প্রজাতি বলে মেনে নেবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এই সমস্ত সাক্ষ্য হল পৃথিবীর বুকে প্রাণী জগতে এক অবিরাম পরিবর্তনের সাক্ষ্য। অর্থাৎ, প্রজাতিগুলির ইতিহাস আছে ; আজকের দিনে যে-সব প্রাণী আমাদের চোখে পড়ে অনেক অনেক যুগ আগে সেই সব প্রাণী পৃথিবীর বুকে ছিল না ; তার বদলে ছিল অন্য ধরনের প্রাণী। এই অন্য ধরনের প্রাণীগুলির বংশধর হল আজকের দিনের প্রাণী। তার মানে, আগেকার সেই সব প্রাণী বদলাতে বদলাতে, বদলাতে বদলাতে আজকের দিনের প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। জীব জগতে চলেছে অবিরাম পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের দরুনই ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর, উন্নত থেকে উন্নততর প্রাণী দেখা দিয়েছে পৃথিবীর বুকে। এরই নাম হল ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিবর্তন।

এ-কথায় অবশ্য কোন সন্দেহ নেই যে ডারউইনের আগেও কোন কোন বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশের কথাটা ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে কাণ্ট, ল্যাপলাস্ আর লেমার্ক-এর নাম উল্লেখ করা দরকার। কাণ্ট আর ল্যাপলাস্ অবশ্য প্রাণী জগতে ক্রমবিকাশ নিয়ে মাথা ঘামান নি ; সৌর জগতের উৎপত্তি নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে নিছক একটি হাইপথেসিস্ বা বৈজ্ঞানিক আন্দাজ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন ক্রমবিকাশের কথা। লেমার্ক-এর বেলায় তা নয়। তাঁর দৃষ্টিটা আবদ্ধ ছিল বিশেষ করে প্রাণী জগতের দিকেই। এই প্রাণী জগতে চলেছে অবিরাম পরিবর্তন, গাছ গাছড়া থেকে শুরু করে জীবজন্তু পর্যন্ত, সর্বত্রই। এ-কথাই হল লেমার্কের মূল কথা। এবং

লেমার্ক এই ব্যাপারটার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাও করলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে লেমার্কের সঙ্গে ডারউইনের দুটি প্রধান তফাৎ। প্রথমত লেমার্কের মতবাদটা তিনি পেশ করেছিলেন নিছক মতবাদ হিসেবেই, তার ভিত্তিতে উপযুক্ত বাস্তব দৃষ্টান্ত বা ঘটনা ছিল না। কিন্তু ডারউইনের মতবাদের ভিত্তিটা বড় মজবুত, দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে একটানা বৈজ্ঞানিক গবেষণা দিয়ে গাঁথা সেই ভিত্তি। দ্বিতীয়ত পরিবর্তন কেন হয়? কেন দেখা দেয় নতুন প্রজাতির প্রাণী? —এই প্রশ্নের উত্তরে লেমার্ক আর ডারউইন স্বতন্ত্র কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ, পরিবর্তনটা তাঁদের দুজনের কাছেই ছিল বাস্তব ঘটনা। এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দুজন দু-রকম মতবাদ সৃষ্টি করলেন। এই দুটি স্বতন্ত্র মতবাদের মধ্যে প্রথমে লেমার্কের মতবাদ উল্লেখ করা যাক। তাতে ডারউইনের কথাটা বুঝতেও সুবিধে হবে। কেননা, ডারউইন যখন গ্রন্থ আকারে তাঁর নিজের মতবাদটা প্রথম পেশ করলেন (১৮৫৯) তার ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে (১৮০৯) লেমার্ক পেশ করেছিলেন নিজের মতবাদ। ডারউইনের সামনে ছিল লেমার্কের কথাগুলো। এই সুদীর্ঘ গবেষণায় পাওয়া সমস্ত দৃষ্টান্ত আর ঘটনাকে লেমার্কের মূল সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি বলেই ডারউইন নতুন কয়েকটি মূলসূত্র সন্ধান করতে বাধ্য হন।

ব্যবহার আর অব্যবহারের কথা দিয়ে লেমার্ক নতুন প্রজাতির আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। ব্যবহার আর অব্যবহারের কথাটা কী রকম তা দেখা যাক। কামারশালে কামার হাতুড়ি পিটে দিন কাটায়, অর্থাৎ ব্যবহার করে তার হাত দুটো। এই ব্যবহারের ফলেই তার হাত দুটো সবল আর মজবুত। কিন্তু কারো হাত ভেঙে যাবার

পর যদি অনেক দিন ধরে তার হাত একটানা বেঁধে রাখা হয় তাহলে সে-হাতের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, অব্যবহার। এবং এই অব্যবহারের ফলে শুকিয়ে যাবে, নিস্তেজ হয়ে যাবে, ওই হাত। এই হল ব্যবহার আর অব্যবহারের কথা। লেমার্ক মনে করলেন, নতুন অঙ্গ আর নতুন দেহগড়ন নিয়ে নতুন প্রজাতির যে আবির্ভাব তার মূলে রয়েছে এই ব্যবহার আর অব্যবহারের কথা। বংশের পর বংশ ধরে একই দিকে কয়েকটি অঙ্গকে ক্রমাগত ব্যবহার করবার চেষ্টা থেকেই সে-অঙ্গ বদলে গিয়ে নতুন এক অঙ্গে পরিণত হয়; আবার বংশের পর বংশ ধরে কোন একটি অঙ্গের ব্যবহার যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত সেই প্রাণী-দেহ থেকে লোপ পায় ওই অঙ্গটি। কেমন ভাবে? যেমন ধরা যাক, পাখীদের কথা। লেমার্ক মনে করেছিলেন পাখীদের যারা পূর্বপুরুষ, অর্থাৎ যে-প্রাণীরা বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত পাখীতে পরিণত হয়েছে, তারা বংশের পর বংশ ধরে ক্রমাগতই সামনের দুটো পা-দিয়ে আকাশে ওড়বার চেষ্টা চালিয়েছিল। এই ব্যবহারের ফলেই শেষ পর্যন্ত তাদের সামনের পা দুটো বদলাতে বদলাতে, বদলাতে বদলাতে পাখীর ডানা হয়ে গেল। কিম্বা, ধরা যাক জিরাফ্‌দের কথা। জিরাফ্‌দের গলাগুলো প্রকাণ্ড লম্বা। কেন? লেমার্ক মনে করতেন, জিরাফ্‌দের যারা পূর্বপুরুষ তারা এমন একটা প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে পড়েছিল যেখানে তাদের পক্ষে খাবার সংগ্রহ করতে হলে গলাটাকে ক্রমাগত উঁচুর দিকে তোলবার চেষ্টা করতে হয়। বংশের পর বংশ ধরে তারা ক্রমাগত এই চেষ্টা চালালো আর শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টার ফলেই তাদের গলার গড়নটা ওই রকম সাংঘাতিক লম্বা হয়ে গেল। অপরপক্ষে, অব্যবহারের ফলে অঙ্গ

লোপের দৃষ্টান্তটাও লেমার্কের কাছে বিরল নয়। যেমন, সাপদের কথা। লেমার্ক মনে করতেন সাপদের যারা পূর্বপুরুষ তারা যুগের পর যুগ ধরে, বংশের পর বংশ ধরে, বন্ধ করেছিল পায়ের ব্যবহার। আর এই ব্যবহার বন্ধ করবার দরুনই শেষ পর্যন্ত তাদের দেহ থেকে পা বলে অঙ্গটাই মুছে গেল। কিম্বা, সুদূর অতীতে কোন এক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার ফলে একদল মাছ এক বিরাট অন্ধকার গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই অন্ধকারের রাজ্যে চোখ বলে অঙ্গের কোন প্রয়োজন ছিল না। ব্যবহার বন্ধ হল চোখের। তাই সেই মাছদের চোখগুলো ক্রমশ আকারে ছোট হয়ে যেতে লাগলো।

লেমার্কের এই মতবাদকে ভালো করে বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে তিনটি মূল কথার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমত, জীবের দেহ-গঠনের উপর পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। দ্বিতীয়ত, চেষ্টার ফলে প্রাণীরা যে নতুন গুণ অর্জন করে সেই গুণ বংশগত সূত্রে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তৃতীয়ত, প্রাণী জগতে যে পরিবর্তন তার মূলে রয়েছে প্রাণীদের বা জীবদের সক্রিয় ইচ্ছা ও চেষ্টা। একে একে তিনটি কথার আলোচনা করা যাক।

পারিপার্শ্বিকের প্রভাব। একটা বিশেষ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পড়েছিল বলেই জিরাফের আদি পুরুষরা বংশের পর বংশ ধরে গলা উঁচু করে খাবার সংগ্রহ করতে চেষ্টা করল; এই চেষ্টা ছাড়া ওই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের খাপ-খাইয়ে নেওয়া—অতএব প্রাণধারণ করা—তাদের পক্ষে সম্ভবই ছিল না! এই চেষ্টা দেখা দেবার আগে পর্যন্ত তাদের গলা মোটেই অমন দীর্ঘ ছিল না। এই ধরণের গলাই হল তাদের বংশগত লক্ষণ। কিন্তু চেষ্টার ফলে একটু একটু করে তাদের গলার গড়নটা

বদলাতে লাগল। অর্থাৎ চেষ্টার ফলে তারা অর্জন করতে লাগল এক নতুন গুণ। এবং এই যে অর্জন করা গুণ এই গুণটুকু বংশগত সূত্রে তাদের উত্তর পুরুষদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল। বোঝবার সুবিধের জন্যে হয়তো কথাটা এইভাবে বলা যায়: "ক" বংশের সেই জীবরা ক্রমাগত গলা উঁচু করে খাবার সংগ্রহ করবার চেষ্টায় নিজেদের গলার গড়নটা বদলে "x.১" করে ফেললো। তাদের সন্তানেরা—অর্থাৎ "খ" বংশের জন্তুরা—যখন জন্মালো তখন থেকেই তাদের এই "x.১" গুণ বর্তমান; অবশ্য একই দিকে আরো বেশী করে চেষ্টা করবার দরুন এই "খ" বংশের জন্তুরা শেষ পর্যন্ত গলার গড়নটাকে আরো খানিকটা বদলে ফেললো। তাই তাদের গলার গড়নে দেখা দিল "x.১+x.২" ধরনের গুণ। তারপর "গ" বংশ জন্মালো "x.১+x.২" গুণ নিয়ে; আরো চেষ্টার ফলে এই গুণটা পরিণত হল "x.১+x.২+x.৩" গুণে। এই ভাবে অনেক অনেক বংশ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা দিল জিরাফের দীর্ঘ গলা। তাহলে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টায় বংশের পর বংশ ধরে গড়নের পরিবর্তন; প্রতিটি বংশে যতটুকু পরিবর্তন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে ততটুকু সঞ্চারিত হয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের বংশধরদের মধ্যে। অর্জন করা গুণও বংশগত গুণের মতই সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তৃতীয়ত, জীবজগতে যেন এক অদৃশ্য শক্তির লীলা চলেছে; এই শক্তির দরুনই যুগ যুগ ধরে প্রাণীর দল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে চায় প্রাণপণে; তাদের এই যে চেষ্টা, এই যে প্রবল বাসনা, যার দরুন শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে এমন মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়, তার মূলে রয়েছে ওই অদৃশ্য শক্তির স্বাক্ষর।

এই হল লেমার্কের মত। এ-মত সম্বন্ধে দুটো কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। প্রথমত, ডারউইন নিজে কতখানি পর্যন্ত এই মত মেনেছিলেন আর দ্বিতীয়ত এই মতবাদের আসল দোষ ত্রুটি ঠিক কোথায়। দোষ ত্রুটি অবশ্য প্রধানত দুটো। এক হল, উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত আর বাস্তব ঘটনার ভিত্তির অভাব। নিজের মতবাদটা প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে লেমার্ক জীবজগৎ থেকে যে-সব দৃষ্টান্ত বা ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেগুলো বাস্তবিকই পরিদর্শন আর প্রয়োগের ভিত্তিতে পাওয়া নয়; বরং বলা চলে অনেকখানিই তাঁর মনগড়া। ঠিক কোন্ জানোয়াররা, ঠিক কোন্ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াবার আশায়, ঠিক কোন্ কোন্ সূক্ষ্ম পরিবর্তন উত্তীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত পরিণত হল জিরাফে লেমার্ক তা দেখাতে পারেন নি। দেখাবার মত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। ফলে তাঁর মতবাদটা অনেকাংশেই তাঁর নিজের চিন্তা আর কল্পনার পরিণাম। কল্পনার পরিণাম মানে উদ্ভট আর আজগুবী কথা নয়; বরং এর মধ্যে আশ্চর্য চিন্তা আর বুদ্ধিরই পরিচয়। তবু, বৈজ্ঞানিক সত্যের আপসহীন মাপকাঠিতে একে স্থূল না বলেও উপায় নেই। আর সেই জন্যেই এই মতবাদের মধ্যে অনেকখানি আধ্যাত্মবাদী কথা নির্বিবাদে নিজের স্থান করে নিয়েছে। প্রাণীজগতে ওই অদৃশ্য শক্তির লীলাখেলার কথা, আর একটুখানি প্রশ্রয় পেলেই এই অদৃশ্য শক্তির লীলাটুকু "রচনাবাদ" বা Taleology-তে পরিণত হয়। "রচনাবাদ" বা Taleology হল এক ধর্মমূলক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে, প্রকৃতিতে আশ্চর্য রকম নিখুঁত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়; প্রকৃতি তাই অন্ধ উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি মোটেই নয়, প্রকৃতি হল কল্যাণময়ের সুচিন্তিত "রচনা"।

সেই কল্যাণময়ের কথা না মানলে প্রকৃতিতে এত আশ্চর্য "রচনা"-র যে স্বাক্ষর সেই স্বাক্ষরের ব্যাখ্যা করা চলে না।

কিন্তু অনেকাংশে স্থূল হলেও, অনেকাংশে এমন কি আধ্যাত্মবাদের (যা কিনা চরম অবৈজ্ঞানিক) সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি ঘটলেও, লেমার্ককে একেবারে দু-কথায় উড়িয়ে দেবার কোন উপায় নেই। এমন কি, ডারউইন নিজেও তা দেন নি। লেমার্কের মতবাদের সঙ্গে ডারউইনের মতবাদের অনেক মৌলিক তফাৎ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু চলতি পাঠ্য-পুঁথিতে প্রায়ই যেমন এই দুটি মতবাদকে আপসহীন বিপরীত মতবাদ বলে বর্ণনা করা হয়, সে ভাবে বর্ণনা করবারও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কথাটা বিশেষ করে এই জন্যে তুলছি যে মিচুরিন-লাইসেনকোর বিরুদ্ধে নানান অভিযোগের মধ্যে একটা অভিযোগ এই যে এঁরা মুখে যতই ডারউইন্-উচ্ছ্বাস দেখান না কেন আসলে কিন্তু ফিরে যেতে চান লেমার্ক-এর মতবাদেই। এই নিন্দা একেবারেই ভিত্তিহীন। তবু একথাতেও কোন সন্দেহ নেই যে মিচুরিন-লাইসেনকোর নব্য জীববিজ্ঞান ডারউইনবাদের নিছক পুনরুক্তি নয়। ডারউইনবাদকে বিজ্ঞানের আরো এক উঁচু ধাপে প্রতিষ্ঠা করা। উঁচু ধাপে প্রতিষ্ঠিত করবার সময় ডারউইনবাদের মধ্যে যেটুকু আজগুবী আর ভ্রান্ত দিক তাকে বর্জন করা, যেটুকু বিজ্ঞানের বিচারে মজবুত তাকে গ্রহণ করা; ডারউইন নিজে ঠিক যে কথাগুলির উপর সবচেয়ে বেশী ঝোঁক দিয়েছিলেন সেই ধরনের অনেকগুলি কথার উপর অমন ঝোঁক নেই, ডারউইন নিজে যে-কথাগুলি মেনে নিয়েছিলেন অথচ যে-কথাগুলির উপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন নি সেই ধরনের কোন কথার উপর বিশেষ ঝোঁক দেওয়া বা গুরুত্ব আরোপ করাও।

এই জাতীয় কথার মধ্যে প্রধান কথা হল লেমার্কবাদের কয়েকটি মূল-সূত্র, যে-মূলসূত্রগুলিকে ডারউইন স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে শুধু স্বীকারই করেছিলেন কিন্তু তার উপর উপযুক্ত ঝোঁক দেওয়ার তাগিদ পাননি। সেই জাতীয় কথাগুলি থেকেই ডারউইনের আলোচনা শুরু করা যাক। জীবজগতে অবিরাম পরিবর্তনের মূলে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের কথা। ডারউইন এই কথাকে সম্পূর্ণভাবেই স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র এই কথাটুকু দিয়ে প্রাণীজগতের সমস্ত পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করা যায় না বলেই এই কথাটুকুকে স্বীকৃতির মর্যাদা দিয়ে যেন একপাশে সরিয়ে রেখেছিলেন, ঝোঁক দিয়েছিলেন অন্য কথার উপর। তার মানে, ক্রমবিকাশের কারণ হিসেবে ডারউইন পারিপার্শ্বিকের প্রভাব মানেন নি, এমনতরো কথা নেহাৎই ভুল কথা হবে; যদিও লেমার্ক যে-অর্থে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব মেনেছিলেন, যতখানি গুরুত্ব আরোপ করে-ছিলেন এই কথাটির উপর—ডারউইন তা মানেন নি, করেন নি। গ্রন্থের ভূমিকায় ডারউইন স্পষ্টই বলেন: "পরিবর্তনের একমাত্র সম্ভব কারণ হিসেবে জীবতত্ত্ববিদেরা বার বার আবহাওয়া, খাদ্য ইত্যাদি বাহ্য সর্তের উল্লেখ করেন। একটু পরে আমরা দেখবো একথা সঙ্কীর্ণ অর্থে সত্যি হতে পারে। কিন্তু, যেমন ধরা যাক কাঠঠোকরার গড়ন—তার পা, তার লেজ, তার ঠোঁট. তার জিভ, এগুলির সাহার্যে কি আশ্চর্য ভাবে গাছের ছাল থেকে পোকা ধরা তার পক্ষে সম্ভব!— এবং এ সমস্তই শুধুমাত্র বাহ্য অবস্থার ফল বলাও অসম্ভব।" (৬) ইত্যাদি। ডারউইনের মতে জীবজগতের পরিবর্তনের মূলে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব ঠিক কতখানি দায়ী সে-প্রশ্ন অবশ্যই স্বতন্ত্র; কিন্তু ডারউইন এই প্রভাবকে আমল দিতে চাননি—এমনতরো কথা নেহাৎই ভুল

কথা হবে। দ্বিতীয়ত, অর্জন করা গুণ বংশগত সূত্রে সঞ্চারিত হবার কথা। এই কথাটা নিয়েই লাইসেন্‌কো ও তাঁর বিরোধী জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তর্ক। এবং লাইসেন্‌কো যে হেতু এই কথাটির উপর খুব জোর দেন এবং যেহেতু কথাটির উপর লের্মাক জোর দিয়েছিলেন, সেই হেতু লাইসেন্‌কোর বিপক্ষদল খুব সরাসরি ঘোষণা করতে চান যে লাইসেন্‌কো পিছু হটতে হটতে ডারউইনকে পেরিয়ে একেবারে লের্মাকবাদের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছেন! অথচ, সে-কথা বললে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসকে সত্যিই বিকৃত করা হবে। আসলে, সত্যিই লের্মাক কথাটার উপর জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও সুনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর কথাটাকে প্রতিষ্ঠিত করবার মত গবেষণার ঐশ্বর্য্য তাঁর ছিল না। তারপর জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে ভাইসম্যান কতকগুলি আপাত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপর (এগুলির কথা পরে আলোচনা করা হবে) নির্ভর করে এই কথাটাকে এমন খেলো করে দিয়েছিলেন এবং মর্গান প্রমুখের এমন সমর্থন সংগ্রহ হয়েছিল ভাইস্‌ম্যানের চার পাশে, যে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে কথাটা প্রায় স্বতঃ-অপ্রমাণে পরিণত হল। এ সম্বন্ধে ডারউইনের কতকগুলো স্পষ্ট উক্তি, এবং কতকগুলো উক্তির স্পষ্ট তাৎপর্য, যেন চাপা পড়ে গেল ভাইস্‌ম্যান-মুখর কোলাহলের মধ্যে। অবশ্যই, ডারউইন নিজে ভাইসম্যানকে অস্বীকার করেননি, বরং স্বীকার করতেই চেয়েছিলেন। ("প্রজাতির উৎস": প্রথম পরিচ্ছেদ)। ডারউইন নিজে তাঁর সমকালীন আরো কয়েক রকম ভ্রান্ত ও বিজ্ঞানস্মন্য মতবাদকে স্বীকার করেছিলেন। ডারউইনের অনেক রকম দুর্বলতা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার যেটা উজ্জ্বলতম দিক

সেটা তাঁর এই সমস্ত আপসগুলিকে উত্তীর্ণ হয়ে, এমন কি খণ্ডন করেও, জীববিজ্ঞানের ইতিহাসকে আলোকিত করে রেখেছে। সেই জন্যেই আজকের দিনের জীববিজ্ঞানে নব্য-ডারউইনবাদী হবার এমন বৈজ্ঞানিক তাগিদ—ডারউইনবাদের সব রকম আপসকে স্বীকার করে নিয়ে সেগুলির নিছক পুনরুক্তি করা নয়, ডারউইনবাদের বৈজ্ঞানিক প্রাণকেন্দ্রকে পুনরুজ্জীবিত করা। ভাইস্‌ম্যান-লাইসেনকো নিয়ে আলোচনা তোলবার সময় এই কথার দীর্ঘতর আলোচনা করা যাবে। আপাতত যে-কথা হচ্ছিল : অর্জিত গুণ, আহরণ করা গুণ,—অর্থাৎ যে গুণ জন্মগত নয় সেই গুণ,—বংশগত সূত্রে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হবার কথা। ডারউইন এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেননি। ডারউইন নিজে বলেছেন : "তখন আমরা দেখতে পাব যে বংশগতিকে অনেকাংশেই বদল করা সম্ভব ; এবং, যা তার সমান বা তার চেয়ে বেশী জরুরী কথা, আমরা দেখতে পাব পরম্পরাগত সূক্ষ্ম পরিবর্তন সংগ্রহ করবার ব্যাপারে মানুষের শক্তি কী অসামান্য।" (৭) অবশ্যই, বংশগতির নিয়ম নিয়ে কোন চরম মন্তব্য তিনি করতে চাননি। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে প্রাণীদেহে নতুন গুণ দেখা দেয় এবং এই সব গুণ বংশগত সূত্রে সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—এই কথাটাই মোটামুটি না মেনে নিলে তাঁর নির্বাচিত অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের কোন মূল্য থাকে না। ডারউইন নিজে এ-কথা কী ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন তা দেখবার চেষ্টা করা যাক। তাঁর গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি গৃহপালিত পশু আর চাষবাস করা ফসলের দৃষ্টান্তকে অবলম্বন করে আলোচনা সুরু করতে চান। বুনো পশু আর বুনো ফসল নয় ; অর্থাৎ, মানুষের আয়ত্তাধীন পরিবেশে যে প্রাণী, সে-ফসল, তার কথা।

এই নতুন পরিবেশের মধ্যে নিশ্চয়ই নতুন গুণ দেখা দিয়েছে প্রাণীদেহ-গুলির মধ্যে। সেই নতুন গুণ বংশগত সূত্রে সঞ্চারিত হচ্ছে। তার মানে, গুণগুলি অর্জন করা গুণ হলেও বংশগত গুণে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি আপত্তি তুলে বলেন: ওই পশু আর ওই উদ্ভিদকে প্রাকৃতিক পরিবেশ ফিরিয়ে দিলে এই সব অর্জিত গুণ আর তাদের মধ্যে থাকবে না - তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে আপত্তিকারক সংশয় তুলছেন অর্জিত গুণের পক্ষে বংশগত গুণে পরিণত হবার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে। ডারউইন উত্তর দিয়েছেন এই সংশয়ের। তিনি বলছেন, প্রাকৃতিক পরিবেশ ফিরিয়ে দিলেই এই সব গৃহপালিত জীবদের মধ্যে থেকে নতুন অর্জিত গুণগুলি মুছে যাবে, ফিরে আসবে পুরনো আর আদিম লক্ষণ,—এমনতর দাবির পক্ষে কোন প্রমানই নেই (৮)। অবশ্যই, ডারউইন যে-প্রসঙ্গে কথাটা তুলছেন, যে-উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলছেন, সেই উদ্দেশ্য, সেই প্রসঙ্গ, স্বতন্ত্র। অর্জিত-গুণের পক্ষে বংশগতসূত্রে সঞ্চারণ-সম্ভাবনা নিয়ে সোজাসুজি তর্কটা নয়। কিন্তু তাৎপর্যটা তাইই। অর্থাৎ, ডারউইনের এই কথা, বা অন্যান্য অনেক কথাকে, আজকের দিনের বিতর্কের পটভূমিতে যদি দেখতে চাই তাহলে স্পষ্টই দেখতে পাবো যে তাঁর রচনার অনেক জায়গায় এমন উক্তি নিশ্চয়ই রয়েছে যার তাৎপর্য বিচার করলে বোঝা যায় অর্জিত গুণ বংশগত সূত্রে সঞ্চারিত হওয়ার কথাটা তাঁর কাছে কোন অসম্ভব কথা নয়।

অবশ্যই, ডারউইনের আসল বক্তব্য এইগুলি নয়। তাঁর আসল বক্তব্য হল প্রাকৃতিক নির্বাচন বা Natural Selection-এর কথা। এবার সেই কথার আলোচনা তোলা যাক।

৬

প্রাণী জগতে চলেছে অবিরাম পরিবর্তন। কথাটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ধরতে পেরেছিলেন লেমার্ক। এমন কি, উপযুক্ত দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও, তিনি অন্তত আন্দাজ করতে পেরেছিলেন এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব, যে প্রভাবের দরুন প্রাণীদেহে দেখা দেয় নতুন গুণ। এই অর্জন করা নতুন গুণ বংশগত সূত্রে সঞ্চারিত হতে হতে, এবং প্রতিটি নতুন বংশে আরো আরো নতুন অর্জন করা গুণের সঙ্গে মিশ্রিত হতে হতে, শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি করে নতুন ধরণের দেহগড়ন। আসলে এই হল লেমার্ক-এর প্রতিভার দিক। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে লেমার্ক-এর আসল দুর্বলতা আর সীমাবদ্ধতার কথা। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব প্রাণীদেহে কেন নতুন গুণ সৃষ্টি করে ? উত্তরে লেমার্ক কল্পনা করেছিলেন, প্রণীজগতে সমস্ত পরিবর্তনের পিছনে যেন এক আধ্যাত্মিক শক্তির লীলাখেলা। প্রাণীদের গভীরেই বুঝি সুপ্ত রয়েছে এক রকম উন্নতির আগ্রহ যার দরুন প্রাণীরা নিত্য নতুন ভাবে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের খাপ

খাইয়ে নেবার চেষ্টায় বিভোর। আসলে এইখানেই লেমার্ক-এর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আর সীমাবদ্ধতা। বাস্তব দৃষ্টান্তের উপযুক্ত সমর্থন বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগ্রহটাও দুর্বলতাই, সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই আধ্যাত্মিক শক্তির কল্পনাটা লেমার্ক-এর অন্যান্য দুর্বলতার পাশে যেন হিমাদ্রী প্রমাণ। কেননা, এইখানে বস্তুবাদের, অতএব বিজ্ঞানেরই, বিসর্জন; ভাববাদের সঙ্গে আপস, যা কিনা আর একটু গড়ালেই এক করুণাময়ের কথামৃতে পর্যবসিত হয়।

এই আধ্যাত্মিক শক্তির ধারণাটাকে একেবারে টুকরো করে ভাঙলেন ডারউইন। ডারউইন দেখাতে চাইলেন পৃথিবীতে এত যে অদল-বদল তার মূলে পৃথিবীর নিয়ম কানুন, প্রকৃতিরই নিয়ম কানুন। তা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওইখানেই ডারউইনের আসল বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, তাঁর বস্তুবাদ আপস মানে না আধ্যাত্মিক কোন কল্পনার সঙ্গে। আর অমন আপসহীন বস্তুবাদীর মেজাজ বলেই তাঁর রচনায় অত অজস্র, অত নিঃসংশয়, বাস্তব দৃষ্টান্তের ভিত্তি। তার মানে কিন্তু এই নয় যে ডারউইনের রচনায় অবৈজ্ঞানিক কল্পনা একটুও ঠাঁই পায়নি। আসলে, যে প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে তিনি প্রাণী জগতের পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন সেই নিয়মের বর্ণনায় বাস্তব বিজ্ঞানকে ঠেলে অবাস্তব কল্পনা অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসতে চায়। ডারউইনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কথা ভাববার সময় তাঁর এই দুর্বলতার, এই সংকীর্ণতার, দিকটুকু বাদ দিয়ে ভাবতে গেলেও প্রকাণ্ড রকম ভুল করা হবে।

প্রকৃতিতে যে অবিরাম পরিবর্তন তার মূলে কোন্ ধরণের প্রাকৃতিক নিয়ম? ডারউইন বললেন, পৃথিবীর বুকে যে পরিমাণে খাবারের

যোগান রয়েছে তার তুলনায় জীবজন্মের সংখ্যা অনেক অনেক বেশী। ফলে, এই সামান্য পরিমাণ খাবারটুকুকে গ্রাস করা নিয়ে প্রাণীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি আর মারামারি। অর্থাৎ, সংগ্রাম। খাবারটুকু না হলে বাঁচবারই কথা ওঠে না। তাই, এ-সংগ্রামের নাম হল বাঁচবার জন্যে সংগ্রাম, জানের দায়ে যুদ্ধ। ডারউইনের এই যে 'জানের দায়ে যুদ্ধ' একে জীবন-সংগ্রাম বললে ভুল করা হবে, কেননা এই সংগ্রাম হল প্রাণীদের সঙ্গে প্রাণীদের সংগ্রাম অথচ জীবন-সংগ্রাম বলতে আমরা বুঝি পৃথিবীর সঙ্গে প্রাণীদের সংগ্রাম, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম। শুধু তাই নয়। ডারউইনের এই জানের দায়ে যুদ্ধ এক প্রজাতির প্রাণীর সঙ্গে অপর প্রজাতির প্রাণীর যুদ্ধ নয়। একই প্রজাতির মধ্যে যুদ্ধ। যেমন ধরা যাক, ব্যাঙাচিদের কথা। ডারউইন বলবেন, একটা ঘোলা জলের ডোবার মধ্যে জন্ম হল অনেক অজস্র ব্যাঙাচির। এত অজস্র যে এইটুকু ঘোলা জলের ডোবায় যে-পরিমাণ খাদ্যের যোগান তা দিয়ে অতগুলো ব্যাঙাচির পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভবই নয়। তাই তাদের মধ্যে এই খাবারটুকু নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি। এই হল জানের দায়ে যুদ্ধ, ডারউইনের ধারণায়। এই সংগ্রাম উত্তীর্ণ হয়ে বাঁচতে পারে মাত্র মুষ্টিমেয় প্রাণী, অধিকাংশই কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কারা বাঁচে? কারা মরে? ডারউইন বললেন, যারা যোগ্য শুধু তারাই বাঁচে; যারা যোগ্য নয় তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু এই যোগ্যতার মাপকাঠিটা ঠিক কী? যারা যোগ্য তারা ঠিক কিসের গুণে যোগ্য? যারা যোগ্য নয় তারা কেন যোগ্য নয়? উত্তরে ডারউইন বললেন, একই প্রজাতির মধ্যে যে-সব প্রাণীর জন্ম তারা সবাই একেবারে হুবহু, একেবারে ছাঁচে ঢালা এক রকমের, প্রাণী নয়।

তাদের মধ্যে তফাৎ থাকে অসংখ্য। কিম্বা, যা একই কথা, একই প্রজাতির প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে কিছু কিছু গুণের পরিচয় রয়েছে যে গুণ একেবারে তার নিজস্ব গুণ, তার বিশিষ্ট গুণ, যে-গুণ আর কারো মধ্যে নেই। এমন কি, একই প্রজাতির মধ্যে এমন দুটি প্রাণী খুঁজে পাওয়া সম্ভবই নয় যে দুটি প্রাণী একেবারে হুবহু একই রকমের। যেমন ধরুন, আমাদের ওই উদাহরণ : ডোবার কোণায় যে অজস্র ব্যাঙাচির জন্ম হল তাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে কিছু কিছু এমন গুণ, এমন লক্ষণ, যা শুধু তার মধ্যেই রয়েছে, আর কারো মধ্যে নেই। অবশ্য, ব্যাঙাচি হিসেবে তাদের সবাইকার মধ্যেই মিল রয়েছে, রয়েছে এমন গুণের পরিচয় যা কারো একার গুণ নয়। কিন্তু বাঁচবার জন্যে সংগ্রাম উত্তীর্ণ হয়ে যে সব প্রাণীরা পৃথিবীর বুকে টিঁকে রইল তাদের টিঁকে থাকবার রহস্যটাকে বুঝতে পারা যাবে ওই নিজস্ব গুণ বা বিশিষ্ট গুণ দিয়ে। কী রকম ভাবে? ডারউইন বলেন, যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জীবদের জন্ম, বাঁচতে হলে সেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া দরকার; অর্থাৎ দরকার এমন গুণ যা দিয়ে নিজেদের জীবনকে আশপাশের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়। একই প্রজাতির প্রাণী হিসেবে জন্মগ্রহণ করার দরুন কতকগুলি গুণ নবজাতকদের সকলের মধ্যে সমান; তাই এই গুণগুলির দিক থেকে আশপাশের অবস্থার সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে নেবার যোগ্যতাও সকলের পক্ষেই সমান হবে। তফাৎ তাহলে, বিশিষ্ট বা নিজস্ব গুণগুলির দিক থেকেই। যার নিজস্ব গুণগুলি যাকে যতখানি সাহায্য করছে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ব্যাপারে তার পক্ষে টিঁকে থাকবার সম্ভাবনা ততই বেশী। ডারউইন আরও দেখাতে

চাইলেন, প্রাণীদের পক্ষে যে অবস্থায় বেঁচে থাকতে হয় দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, সেই অবস্থা বদলে যেতে থাকে। ফলে এই পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে দেশে দেশে, যুগে যুগে, প্রাণীদের পক্ষে নতুন নতুন গুণ দরকার পড়ে। তাই যে-সব প্রাণীদের মধ্যে এমনতরো বিশিষ্ট বা নিজস্ব গুণ দেখা দেয় যার ফলে পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া বেশী করে সম্ভব, সেই সব প্রাণীরাই টিঁকে যায় পৃথিবীর বুকে। এই হল নিয়ম, নিছক প্রকৃতির নিয়ম। এখন, এই যে সব বিশিষ্ট আর নিজস্ব গুণ যার ফলে প্রকৃতিতে নির্বাচিত প্রাণীরা জানের দায়ে যুদ্ধ উত্তীর্ণ হয়ে টিঁকে থাকতে পারল, এই গুণগুলি ডারউইনের মতে বংশগত সূত্রে তাদের সন্তানের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। অবশ্য, এই সব সন্তানদের মধ্যে প্রত্যেকেরই কিছু কিছু বিশিষ্ট আর নিজস্ব গুণ থাকবে; তার ফলেই তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নতুন করে সংগ্রামে জিতে যাবে, কেউ কেউ যাবে হেরে। যারা জিতবে তারাই টিঁকে থাকবে, যারা হারবে তাদের চিহ্ন মুছে যাবে। তারপর এই বিজয়ী প্রাণীদের সন্তান হিসেবে আর একটি নতুন বংশের জন্ম। এই নতুন বংশের প্রাণীদের মধ্যে কী কী লক্ষণ থাকবে? বংশগত সূত্রে পাওয়া আগেকার দুটি বংশের এমন কিছু বিশিষ্ট গুণ যা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ব্যাপারে বিশেষ জরুরী আর তাছাড়া আলাদা আলাদা ভাবে নিজের নিজের কিছু কিছু বিশিষ্ট গুণ। নতুন বংশের সামনে আবার বাঁচবার জন্যে নতুন করে সংগ্রাম, নতুন বংশের মধ্যে আবার নিজস্ব গুণের সমাবেশ। এই ভাবে বংশের পর বংশ ধরে নতুন, আরো নতুন, আরো আরো নতুন গুণের সমাবেশ হয়ে চলে। আর শেষ পর্যন্ত এই

সমাবেশের ফলে পৃথিবীর বুকে গড়ে ওঠে এক রকম অভূতপূর্ব বা নতুন ধরনের প্রাণী। অর্থাৎ নতুন প্রজাতির জন্ম। ডারউইন তাই বলছেন' প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে নবপ্রজাতির জন্ম। প্রাকৃতিক নির্বাচন হল জীবজগতের ওই পুরো নিয়মটা : খাদ্যের তুলনায় প্রাণীদের সংখ্যাধিক্য, তাই প্রজাতির মধ্যেই জানের দায়ে যুদ্ধ, সে-যুদ্ধে যোগ্যতমের জয়' যোগ্যতার মূলে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ব্যাপারে বিশিষ্ট আর নিজস্ব গুণ, বংশগত সূত্রে এই গুণগুলি নতুন বংশের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া আর তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া নব্যবংশের বিভিন্ন প্রাণীর বিশিষ্ট. স্বতন্ত্র. গুণ ; আবার জানের দায়ে নতুন যুদ্ধ, আবার যোগ্যতমের জয়। ডারউইনের এই যে সিদ্ধান্ত এর মধ্যে কোন রকম আধ্যাত্মিকতার ছিটেফোঁটা নেই। নিছক পৃথিবীর বিষয় দিয়ে পৃথিবীকে বোঝবার চেষ্টা, শুধু প্রকৃতির নিয়ম দিয়ে প্রকৃতির পরিবর্তনের ব্যাখ্যা খোঁজা। আর বাস্তব দৃষ্টান্তের নমুনা : দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে সঞ্চয় করা দৃষ্টান্ত, বড় কম কথা নয়।

আধ্যাত্মিকতা-বিসর্জন ও বাস্তবমুখী মেজাজ ছাড়াও ডারউইনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার আরো নানান উল্লেখযোগ্য দিক আছে। প্রথমত প্রয়োগের দিকে ঝোঁক, যে ঝোঁকটুকু বাদ দিলে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানই থাকে না। প্রয়োগই যোগায় বিজ্ঞানের প্রাণশক্তি। ডারউইনের রচনায় প্রয়োগের উপর ঝোঁকটা কী ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার অন্তত দুটি নমুনা উল্লেখ করা যাক। গ্রন্থের শুরুতেই ডারউইন আলোচনা তুলেছেন, গৃহপালিত উদ্ভিদ আর প্রাণীদের নিয়ে। প্রাণীজগতের যে-গণ্ডিটুকু গৃহপালন দিয়ে ঘেরা সেখানে প্রয়োগ, সেখানে মানুষের কারিগরি, সেখানে পৃথিবীকে বদল করবার

তাগিদ। ডারউইন পদে পদে উল্লেখ করছেন যারা ফুলের আর ফলের বাগান করে তাদের অভিজ্ঞতার কথা, চাষীদের অভিজ্ঞতার কথা, যারা জানোয়ারের চাষ করে (animal breeders) তাদের কথা। এই সমস্ত অভিজ্ঞতাই হল প্রয়োগের অভিজ্ঞতা,—নিছক গবেষণাগারের সংস্কৃত আর পরিচ্ছন্ন প্রয়োগও নয়, যে প্রয়োগের মূলে বৃহৎ জীবন, পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, সেই প্রয়োগ। আর ডারউইন স্পষ্টই বলছেন, প্রাণীবিদ্যার অনেক কূট তত্ত্বই এই প্রয়োগের আলোয় স্পষ্টভাবে বোঝবার সম্ভাবনা :

> "পরিদর্শনের কাজ শুরু করবার সময় আমার মনে হয়েছিল গৃহপালিত পশু এবং কৃষিজাত শস্য ভালো করে পরীক্ষা করলে পর এই দুরূহ সমস্যার কিনারা পাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। এবং আমি হতাশ হই নি : এই ব্যাপারে এবং অন্যান্য সমস্ত গোলমেলে ব্যাপারে আমি প্রত্যেকবারই দেখেছি যে গৃহপালিত অবস্থার মধ্যে যে পরিবর্তন সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যতই অসম্পূর্ণ হোক না কেন তার থেকেই সবচেয়ে ভালো আর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায়।" (৯)

ডারউইনের এই প্রয়োগপরায়ণতার আর একটি দিক হল জীববিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর মত। সে উদ্দেশ্য শুধুই বিশুদ্ধ জ্ঞান কুড়নো নয়, নয় নির্বিকল্প তত্ত্বজিজ্ঞাসা। জীববিদ্যায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে যদি মানুষের শুধু রহস্যবোধটুকুই তুষ্ট হত তাহলে ব্যাপারটার গুরুত্ব নিশ্চয়ই অতখানি হতে পারত না। ব্যাপারটার গুরুত্ব অসামান্য তার আসল কারণ এই জ্ঞান মানুষের সামনে খুলে দেয় প্রকৃতিকে জয় করবার অতুল সম্ভাবনা। ডারউইন বলছেন :

"তখন আমরা দেখতে পাব যে বংশগতিকে অনেকাংশেই বদল করা সম্ভব ; এবং. যা তার সমান বা তার চেয়ে বেশী জরুরী কথা, আমরা দেখতে পাব পরম্পরাগত সূক্ষ্ম পরিবর্তন সংগ্রহ করবার ব্যাপারে মানুষের শক্তি কী অসামান্য।" (১০)

কিম্বা :

"তবুও এই সম্পর্কগুলির কথা অত্যন্ত জরুরী, কেননা তার উপরই নির্ভর করছে এই পৃথিবীর প্রত্যেক বাসিন্দার বর্তমান মঙ্গল এবং আমার ধারণায়, তাদের ভবিষ্যৎ সাফল্য ও পরিবর্তন!" (১১)

দ্বিতীয়ত, দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা। প্রকৃতিকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখবার চেষ্টাটা যে নেহাতই ভুল চেষ্টা এ-কথা ডারউইনের আগে পর্যন্ত আর কোন বৈজ্ঞানিকের কাছে এমন স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে ধরা পড়েনি। ডারউইন প্রকৃতিকে দেখতে চেয়েছেন সমগ্রভাবে, পুরোপুরিভাবে, একসঙ্গে। তার মধ্যে জড় আছে, জীবন আছে. কিন্তু কেউই নয় স্বাধিকার-প্রমত্ত, স্বতন্ত্র। জড়ের উপর জীবনের প্রভাব, জীবনের উপর জড়ের প্রভাব ; জীবনের গতিপথ জড়কে বদল করে চলেছে আবার জীবনের গতিপথে পরিবর্তন আনছে জড়ের প্রভাব Interaction, Interdependence—পরস্পরের উপর পরস্পরের নির্ভরতা—দুনিয়া জোড়া এই নিয়মের জাল। ডারউইন দেখালেন প্রাণীজগতে যে পরিবর্তন তা শুধুমাত্র প্রাণীজগতের কথা দিয়ে বুঝতে পারা যায় না। এই পরিবর্তনকে বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে পরিবেশের কথা, প্রকৃতির কথা। দৃষ্টির এই সমগ্রতায় ডারউইন-এর বৈজ্ঞানিক মেজাজের আর একটি পরিচয়। কেননা, দুনিয়ায় আপাতত যে সব দশ রকমের জিনিস সেগুলিকে নিছক দশ-রকম বলে মেনে নেওয়াটা বৈজ্ঞানিক

চেতনার পরিপন্থী : সেগুলির মধ্যে আত্মীয়তা সন্ধান, পরস্পর নির্ভরতার সন্ধান, পরস্পরের উপর প্রভাব সন্ধান, বিজ্ঞানের একটি মূল দায়িত্ব। আধ্যাত্মিকতা বর্জন, বাস্তবমুখীতা, প্রয়োগপরায়ণতা, দৃষ্টির সমগ্রতা,— এই সমস্তের মধ্যেই ডারউইনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয়। আর এরই সঙ্গে একেবারে আপসহীন পরিবর্তনবাদ। দুনিয়াটা সনাতন নয়, অবিরাম পরিবর্তনই পৃথিবীর নিয়ম, যুগ যুগ ধরে স্থিতির যে একটানা ধ্যান তা নেহাতই একরকম দার্শনিক আত্মপ্রবঞ্চনা—এই কথাটা ডারউইন এত স্পষ্ট আর এমন জোরালো ভাবে প্রমাণ করলেন যে তারপর পরিবর্তনবাদ প্রায় বৈজ্ঞানিক সহজবুদ্ধিতে পরিণত হতে চাইল।

মনে রাখতে হবে, ডারউইনের এই বহুমুখী বৈজ্ঞানিক প্রতিভাই তাঁকে ধার্মিক মহলের পরম শত্রু করেছিল। কেননা, ধর্মের মূলে যে আধ্যাত্মিকতা, সৃষ্টিবাদ, ধার্মিক মহলের বাস্তব আর প্রয়োগবিমুখতা, দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং স্থিতিবাদ—ডারউইন তার প্রত্যেকটি টুকরো করে ভেঙেছেন, মিশমার করেছেন। তাই মানুষের ইতিহাসে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ধার্মিক মহলের যত রকম চক্রান্ত আর বিক্ষোভ তার মধ্যে ডারউইনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, ডারউইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সবচেয়ে প্রবল। শুনতে অবাক লাগে যে আজও মার্কিন মুলুকে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডারউইনবাদ একেবারে নিষিদ্ধ কথা। অবশ্যই এ-সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররা পাদরী প্রধান, তাই।

তবুও সেই সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা একান্ত দরকার যে ধর্মের মোহকে অমন নির্মমভাবে ভাঙতে পারলেও ডারউইনের দৃষ্টি সম্পূর্ণ মোহমুক্ত নয়। কেননা, ধর্মমোহের বদলে আর একরকম মোহ তাঁর দৃষ্টিকে

আচ্ছন্ন করতে চেয়েছে। 'যুগের মোহ' নাম দিলে কথাটা অস্পষ্ট থাকে; তাই এর নাম দেওয়া দরকার 'শ্রেণীর মোহ'! তখন বুর্জোয়া শ্রেণীর জয়জয়কার, বিশেষ করে ইংলণ্ডে পূর্ণ ধনতন্ত্রের বিজয় কেতন। আর ধনিক শ্রেণীর মনের কথাটা পাণ্ডিত্যে ভূষিত করে পেশ করেছেন ম্যালথাস নামের জনৈক ইংরেজ। ডারউইনের আসল মোহ, আসল সংকীর্ণতা হল ম্যালথাসের এই পণ্ডিতম্মন্য কথাগুলোকে বিজ্ঞান বলে মেনে নেওয়া, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ম্যালথাসবাদকে প্রসারিত করা।

পৃথিবীর জনসংখ্যা নিয়ে ম্যালথাস একটি আপাত বৈজ্ঞানিক মত দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন। তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে হু হু করে। কিন্তু যে-অনুপাতে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে সেই অনুপাতে বাড়ছে না খাবারের যোগান। ফলে, দৈন্য, হাহাকার আর অভুক্ত মানুষের মিছিল। রক্ষা শুধু এই যে পালে পার্বণে মানুষের কপালে খুব বড়সড় সর্বনাশ জোটে। যুদ্ধ আর মহামারী আর ওই ধরনের সর্বনাশ। এই সব সর্বনাশের আশীর্বাদেই পৃথিবীর বুক থেকে সাফ হয়ে যায় ফালতু মানুষের জঞ্জাল; যাদের পেট ভরবার নয়, তারা। যারা ফালতু মানুষ তারা কেন ফালতু মানুষ? কেন তাদের কপালে লেখা নেই পেট ভরবার সম্ভাবনা? কেননা, তারা দুর্বল, তারা ক্ষীণ, বাঁচবার জন্যে যে হিম্মৎ লাগে সেই হিম্মৎ নেই তাদের। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যারা বাঁচল, জীবনে যারা পেল সার্থকতা, তারা বীর বলেই বাঁচল, বীরত্বের গুণেই তারা পেল সার্থকতা।

ম্যালথাসের এই মতবাদ বিজ্ঞান নয়। নির্লজ্জতম শোষকতুষ্টি।

বিজ্ঞান নয়। কেননা, পৃথিবীতে জনসংখ্যা বেড়ে চলবার হিসেবটা যে-রকম সত্যি সেই রকমেরই সত্যি হল মানুষের হাতিয়ারের

উন্নতি হবার কথা। দিনের পর দিন হাতিয়ারের উন্নতি, দিনের পর দিন পৃথিবীকে বেশী করে, নতুন করে জয় করতে শেখা। একদিকে, মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ; অপর দিকে বেড়েছে উৎপাদনের শক্তি। ধনতন্ত্রের যুগে দেখতে পাওয়া গেল মানুষের এই উৎপাদন শক্তি এমন অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে যে পুরনো পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যও এর পাশে ম্লান হয়ে যায়। এই উৎপাদন শক্তি পৃথিবীকে প্রাচুর্যে পূর্ণ করতে পারে ; কিন্তু তবুও মানুষের কপাল থেকে ঘোচে না অভাবের চিহ্ন। আপাততঃ মনে হয় যেন রহস্য, যেন আজগুবী ব্যাপার। কিন্তু রহস্য নয়। প্রাচুর্যের মধ্যেও এত হাহাকার তার আসল কারণ হল উৎপাদনের উপায়ের উপর মুষ্টিমেয় মালিকের ব্যক্তিগত মালিকানা, যাদের জীবনে একমাত্র পুরুষার্থ মুনাফা অন্বেষণ। মুনাফালোভের খাঁচায় পোরা উদ্দাম, অবিশ্বাস্য উৎপাদন শক্তি, একে মুক্তি দিলে জনগণের ঘর প্রাচুর্যে টলোমলো হবে কিন্তু তাতে মালিকদের হালখাতায় হাহাকার পড়বার ভয়। দৈত্যের মত বিরাট বিরাট কারখানায় যতখানি জিনিষ তৈরী করা সম্ভব ততটা জিনিষ যদি তৈরী করে জনসাধারণের ভোগের জন্যে বিনা লাভে ছেড়ে দেওয়া হয়, যতগুলো কারখানা মানুষের পক্ষে খোলা সম্ভব ততগুলো কারখানা গড়ে তোলবার কাজে মানুষের দল যদি কোমর বাঁধে, যদি বিরাট বিরাট কলের লাঙল লাগিয়ে দিগন্ত জোড়া মাঠে আবাদের আয়োজন করা যায় আর তার সঙ্গে যদি জোটে বৈজ্ঞানিকের আধুনিকতম আবিষ্কার—বীজ সম্বন্ধে, সার সম্বন্ধে, জলসেচ সম্বন্ধে............তাহলেও কি মানুষের কপাল অভাবের চাপে কুঁচকে থাকতে বাধ্য ? নিশ্চয়ই নয়। তবু, ধনতন্ত্রের আমলে দেখা গেল প্রাচুর্যের এমন অবিশ্বাস্য সম্ভাবনা সত্ত্বেও বেশীর ভাগ মানুষের কপালে

উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণ বসন। কেননা, ধনতন্ত্রের আওতায় মুনাফার খাতিরে উৎপাদন, মানুষের ভোগের জন্য নয়, অভাব মোচনের খাতিরে নয়। ম্যালথাসের কথাটা বিজ্ঞান নয়। সোভিয়েট দেশের বিজ্ঞানী হিসেব দাখিল করেছেন : আজকের দিনে বিজ্ঞান উৎপাদনের উপায়ে যতখানি উন্নতি লাভ করেছে শুধু সেইটুকুর উপর নির্ভর করলেই পৃথিবীতে অন্তত ৬৬০ কোটি মানুষের পেট ভরবার মত প্রচুর খাবার উৎপন্ন করা যায়, অথচ আজকের পৃথিবীতে জনসংখ্যা হল ২২০ কোটি (১২)। তাছাড়া, আগামীকাল বিজ্ঞান অগ্রগতির কোন চূড়োয় পৌছবে, উৎপাদনের উপায়ে দেখা দেবে কী অসম্ভব উন্নতি, তাই নিয়ে রাত ভোর কল্পনা করেও কিনারা পাওয়া ভার। তাই, ম্যালথাসের মতো মহামারী আর যুদ্ধ, ভূমিকম্প আর দুর্ভিক্ষ — এই সব সর্বনাশের মুখ চেয়ে বসে থাকবার কথাই ওঠে না।

তবু, এ-কথাতেও কোন সন্দেহ নেই যে আজকের এই ২২০ কোটি মানুষের মধ্যে ৯০ কোটি মানুষের দু-বেলা পেট ভরে খাবার জোটে না। তার আসল কারণ এই পুঁজিবাদ, উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকদের পাহারাদারী। আর এই আসল কারণটাকে ভালো করে ধামা চাপা দিতে না পারলে পুঁজিপতিদের সমূহ বিপদ। অভাবের মহাসাগরে বাহুল্যের আর অপচয়ের ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে তাঁদের অধিষ্ঠান। মিথ্যে কথা দিয়ে সত্যি কথাটা ঢেকে রাখতে না পারলেই নয়। তাই মালিকদের পোষা প্রচারকেরা হরেক রকম মিথ্যে কথা প্রচার করায় অমন উৎসাহী।

কেউ বা সাজেন পুরোহিত আর পাণ্ডার সাজে। বলেন : সবই মঙ্গলময়ের কূট ইচ্ছে। সেই ইচ্ছের চুল চেরা বিচার করতে যাওয়া

মানুষের পক্ষে নেহাতই অর্বাচীনতা। দুঃখ দেখে, অভাব দেখে, ক্ষেপে উঠলে চলবে না। ইহকালের শাকান্ন নিয়ে ঝামেলা শুরু করলে পরকালের পরমান্নে টান পড়বে! বিধাতা বিরূপ হবেন।

আবার কেউ বা ধরেন বৈজ্ঞানিকদের ছদ্মবেশ। হরেক রকম বোল-বুলি, হরেক রকম বুদ্ধির কসরত দেখিয়ে তাঁরা প্রচার করতে চান তাঁদের পোষক শোষক-শ্রেণীর মনের কথা। এই জাতীয় একটি কথার নমুনা হল ম্যালথাসবাদ। জনগণের কাছ থেকে সত্যি কথাটা গোপন করবার তাগিদ, মিথ্যে কথার মোহে তাদের দৃষ্টিকে দিকভ্রান্ত করবার তাগিদ। ম্যালথাস বললেন, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা; যারা প্রাচুর্যকে পেয়েছে তারা নিজেদের হিম্মতের দরুনই পেয়েছে। যাদের কপালে অভাব তারা অযোগ্য, তাই। অযোগ্যদের পক্ষে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে, নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে,—এই হল নিয়ম।

ম্যালথাসের মতবাদ তাই বিজ্ঞান নয়, শোষকতুষ্টি। আর ডারউইনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা,—তাঁর অমন অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সত্ত্বেও দুর্বলতা,—ম্যালথাসের এই নির্লজ্জ শোষকতুষ্টিকে বিজ্ঞান মনে করা; শুধু তাই নয় জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ম্যালথাসবাদকে পুরোপুরিভাবে আমদানী করবার উৎসাহ। ডারউইন বলছেন:

"এটা হল প্রাণী জগৎ আর উদ্ভিদ জগতের উপর ম্যালথাসের মতবাদের প্রয়োগ। যেহেতু প্রতিটি প্রজাতির মধ্যে যতগুলি বিশিষ্ট প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশীর জন্ম হয়; এবং যেহেতু, তার ফলে, প্রায়ই ঘুরে ফিরে দেখা দেয় টিঁকে থাকবার সংগ্রাম, সেইহেতু জীবনের জটিল ও পরিবর্তনশীল পরিবেশে যদি কোন প্রাণীর মধ্যে তার নিজের পক্ষে সুবিধাজনক কোন অদল-

বদল দেখা দেয় তাহলে তার পক্ষে টিঁকে থাকবার সম্ভাবনা অনেক বেশী ; অতএব সে প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হবে। বংশগতির জোরালো নিয়ম অনুসারে নির্বাচিত যে-কোন প্রাণী নিজের অনুরূপ, অভিনব ও পরিবর্তিত রূপের জন্ম দেবার চেষ্টা করবে।" (১৩)

শুধু তাই নয়, ম্যালথাসের এই কল্পনাকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়ে বসা ছাড়াও, ডারউইনের রচনার আর একটি গভীর দুর্বলতার পরিচয় আছে। সে দুর্বলতা হল, শেষ পর্যন্ত আপতন বা দৈবকে স্বীকার করে বসা। প্রশ্ন ওঠে, ওই নিজস্ব আর বিশিষ্ট গুণ নিয়ে। একই প্রজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও একটি প্রাণীর মধ্যে দেখা দিল এমন কিছু গুণ যা আর কারো মধ্যে দেখা দিল না! এমনতরো ঘটনা কেন ঘটে প্রকৃতিতে ? এই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব খুঁজে না পেয়ে ডারউইন সোজাসুজি দৈবের দারস্থ হয়ে পড়েন। অমন ব্যাপারটা হঠাৎ হয়, দৈবাৎ হয়, অকারণে হয়।

Fortuitous Variation, পরিবর্তনটা যেন খামখেয়ালী। কিন্তু একথা স্বীকার করা মানেই বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা। কেননা বিজ্ঞানের সবচেয়ে প্রাথমিক মূলসূত্র হল কার্যকারণবাদ : প্রকৃতিতে প্রতিটি ঘটনার নির্দিষ্ট কারণ থাকতে বাধ্য। আপেলটা মাটির দিকে কেন পড়ল ? নিউটন যদি মনে করতেন এমনি-এমনি পড়ল, অকারণেই পড়ল, খামকা পড়ল—তাহলে তো সবই চুকে যেত, গড়ে উঠত না মাধ্যাকর্ষণবাদ, পঙ্গু হয়ে থাকত পদার্থবিজ্ঞান। বিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে বিশিষ্ট গুণ দেখা দেবার পূর্ণ রহস্য ডারউইনের কাছে ধরা পড়েনি ; জ্ঞানের এই ফাঁকটাকে দৈবাতের কথা দিয়ে তিনি পূরণ করতে চেয়েছিলেন।

৪

ডারউইনের অন্তর্দ্বন্দ্ব। একদিকে অমন চরম বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আর একদিকে অবৈজ্ঞানিক মতের কাছে অমন করুণ সমর্পণ। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা মনে না রাখলে বুঝতে পারা যাবে না ভাইসম্যানের গ্রন্থ কেমন করে স্বয়ং ডারউইনের ভূমিকা বুকে নিয়ে প্রকাশিত হতে পারল।

অগস্ট ভাইসম্যান। ১৮৩৪-১৯১৪। জার্মান "জীবতত্ত্ববিদ"। ১৮৮২-তে, অর্থাৎ ডারউইনের গ্রন্থ প্রকাশিত হবার বছর তেইশ পরে, প্রকাশিত হল ভাইসম্যানের গ্রন্থ: "স্টাডিস্ ইন্ দি থিয়োরীস্ অফ্ ডিসেণ্ট"। এই গ্রন্থের ভূমিকায় খোদ ডারউইনের স্বাক্ষর! ব্যাপারটা অত্যন্ত বিস্ময়কর, প্রথমত এই কারণে যে ডারউইনের মেজাজের সঙ্গে ভাইসম্যানের মেজাজে মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু তা ছাড়াও আর একটি কারণ রয়েছে এবং সেই কারণটিকেই প্রধান কারণ বলতে চাই: ভাইসম্যানের উপসংহার ডারউইনের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত;

অর্থাৎ, ভাইসম্যানের সিদ্ধান্ত ঠিকমত অনুসরণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে ডারউইনের যেটা মূল সিদ্ধান্ত—প্রাণী জগতে চলেছে অবিরাম পরিবর্তন—সেই মূল সিদ্ধান্তই আর টিঁকতে পারে না।

প্রথমত মেজাজ। কম বয়সে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছিল বলে ভাইসম্যান অণুবীক্ষণ নিয়ে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ তাঁর আলোচনাটা প্রধানত জীবকোষ নিয়েই, যে জীবকোষকে অণুবীক্ষণ দিয়ে হাজার গুণ বড় করে না দেখলে দেখতেই পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তিনি অণুবীক্ষণ বিচ্যুত হয়েছিলেন বলেই ছিন্ন হয়েছিল বাস্তব পরিদর্শনের সঙ্গে তাঁর মতবাদের যোগসূত্র। তিনি বাধ্য হয়েছিলেন নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তাধারার উপর অনেক বেশী করে নির্ভর করতে। অথচ বাস্তব দৃষ্টান্তের যোগসূত্র ছিঁড়ে ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও রুচির সুতো কেটে কোন মতবাদ পেশ করতে গেলে সেই মতবাদের মধ্যে অবাস্তব—অতএব বিজ্ঞান-বিরোধী—কল্পনার প্রবেশ সম্ভাবনা সুগম হয়ে পড়বার কথাই। ভাইসম্যানের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবেই তা দেখতে পাওয়া যায়। কথাটা যে নিছক সোভিয়েট জীবতত্ত্ববীদদের 'অপপ্রচার' নয় তার সমর্থনে নানান নজির। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় ভাইসম্যানের জীবনী লেখবার সময় লেখক স্পষ্টভাবেই স্বীকার করছেন যে ভাইসম্যানের মতবাদ থেকে ধর্মমূলক ব্যঞ্জনা বাদ দেওয়া যায় না। তাছাড়া ভাইসম্যানের সমসাময়িক জীবতত্ত্ববিদদের মধ্যে যাঁরা সত্যিই ডারউইনের মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন,—যাঁদের কথা উল্লেখ করবার সময় গোঁড়া ডারউইন-পন্থী বলে উল্লেখ করবার প্রথা—তাঁরা তীব্র আপত্তি তুলেছিলেন ভাইসম্যানের এই আধা-ধর্মান্ধ মতবাদটির বিরুদ্ধে (১৪। মেজাজ ছাড়াও মূল সিদ্ধান্তের কথা। সেইটাই আসল কথা,

এবং অবশ্যই এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ধর্মমোহাচ্ছন্ন মেজাজটার কথা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আবদ্ধ।

ভাইসম্যানের মূল সিদ্ধান্তের একটা খসড়া করা যাক।

তাঁর মতে জীবদেহ দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত। ইংরেজিতে এই দুটি অংশের নাম দেওয়া হয় জার্ম প্লাসম্ এবং সোমা, বাংলা করলে বলা চলে বীজবস্তু আর দেহবস্তু। জীবজন্মের সঙ্গে দেহবস্তুর কোন রকম সম্পর্কই নেই। প্রজননের মূলে শুধুমাত্র বীজবস্তু। তাই প্রজনন ব্যাপারে বাকি দেহটার এতটুকুও হাত নেই। বীজবস্তুর দরুনই সন্তানের বীজবস্তু এবং দেহবস্তু দুইই গড়ে ওঠে, এবং এই বীজবস্তুই—একমাত্র বীজবস্তুই—সব রকম বংশগত গুণের একমাত্র বাহক, অর্থাৎ সন্তানের মধ্যে কোন্ গুণ দেখা দেবে তা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করছে বীজবস্তুটুকুর উপর, তাই বংশগতির ব্যাপারে বাকি দেহটার করবার নেই কিছুই। শুধু তাই নয়, ভাইসম্যানের মতে এই তথাকথিত বীজবস্তু বলে জিনিসটা অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত, অমর। বীজবস্তুর জন্ম নেই, মরণ নেই। পিতামাতার বীজবস্তুই সন্তানের বীজবস্তু হিসেবে টিঁকে থাকে, আবার এই বংশের বীজবস্তু টিঁকে থাকে উত্তর বংশের বীজবস্তু হিসেবে। বংশ পরম্পরার মধ্যে একই বীজবস্তুর অমর আত্মকথা। মরণ হয়, ধ্বংস হয়, দেহবস্তুটুকুর। কিন্তু এই দেহবস্তু বলে জিনিসটার তো আসলে কোন মূল্যই নেই—বীজবস্তুর বাহক হিসেবে, বীজবস্তুর পুষ্টিবাহী পরিবেশ হিসেবে এই দেহবস্তু বলে জিনিসটা নেহাতই এক তুচ্ছ, মরণশীল উপরি উৎপাদন। ফলে, জীবদ্দশায় কোন প্রাণীর দেহে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যে যে সব পরিবর্তন দেখা দেয়,—অর্থাৎ যাকে আমরা অর্জন করা গুণ বলে উল্লেখ

করেছি সেই গুণ,—তার পক্ষে বংশগত সূত্রে সঞ্চারিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই; কেননা এই গুণ নেহাতই দেহবস্তুর গুণ, এবং বংশগতির ব্যাপারে দেহবস্তুর কোন হাতই নেই। ফলে, জীববিদ্যায় ভাইসম্যান লেমার্ককেই প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখবার চেষ্টা করলেন। লেমার্ক-খণ্ডন প্রসঙ্গে ভাইসম্যান বললেন, "বংশগতির ব্যাপারে সমস্ত মূল ঘটনা-গুলি পর্যন্ত না পৌঁছে উপায় নেই, এবং এই ঘটনাবলীর সঙ্গে ঠিক কোন্ বস্তুর যোগাযোগ তা নির্ণয় না করে উপায় নেই। আমার মতে, একমাত্র বীজকোষের বস্তুই এই বস্তু হতে পারে; এবং এই বস্তুটি বংশ পরম্পরা-গতভাবে অপরিবর্তিত অবস্থায়,—এবং বিশিষ্ট প্রাণীটির জীবদ্দশায় যা ঘটে তার অনুরূপ প্রভাব থেকে সব সময় সম্পূর্ণ মুক্তভাবে,—নিজের বংশগত লক্ষণগুলি সঞ্চারণ করে চলে।" (১৫)

তাহলে ভাইসম্যানের মত অনুসারে আসল কথা হল:

১) বংশগতির ব্যাপারে আসলে দায়ী বীজবস্তু নামের এক অমর, অপরিবর্তনীয় পদার্থ।

২) এই পদার্থের সঙ্গে বাকি দেহের কোন সম্পর্ক নেই।

৩) পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব দেহবস্তুর উপর পড়তে পারে, কিন্তু ওইখানেই তার ইতিহাস শেষ। অর্থাৎ সে প্রভাবের দরুন বিশিষ্ট প্রাণীর দেহে যে নতুন অর্জন করা গুণ দেখা দেয় সে-গুণ সেই বিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যেই একান্তভাবে সীমাবদ্ধ, বংশগত সূত্রে সন্তানের মধ্যে তা সংক্রামিত হতে পারে না।

স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় এই মতবাদ যদি ঠিক হয় তাহলে ডারউইনের মূল সিদ্ধান্তগুলিও ভ্রান্ত হতে বাধ্য। কেননা, ডারউইনের মূল কথা হল, প্রাণী জগতে চলেছে অবিরাম পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে

প্রাণীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অথচ, সন্তান উৎপাদনের এবং সন্তানের মধ্যে বংশগত গুণগুলি সঞ্চারণ করবার জন্যে যদি একমাত্র এক শাশ্বত, পরিবর্তন-উত্তীর্ণ বীজবস্তু নামের কোন বস্তুই সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী হয় তাহলে মানতে হবে জীবজগতে যে সব পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে, তা আসলে নেহাতই তুচ্ছ এক ব্যাপার; তার মূলে রয়েছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর দেহবস্তুর কথা, এবং প্রাণীজগতের ইতিহাসে এদের কথা নেহাতই অবান্তর ও তুচ্ছ কথা মাত্র।

ভাইসম্যানের জীবদ্দশাতেই প্রকৃত ডারউইন-পন্থীদের মধ্যে এই মতবাদের বিরুদ্ধে কেন এত বিক্ষোভ তা বুঝতে পারা কঠিন নয়। ভাইসম্যানের মতবাদের বিরুদ্ধে ধর্মমোহের অভিযোগটা এমন কি বুর্জোয়া পণ্ডিত মহল থেকেই কেন উঠছে তা বুঝতে পারাও কঠিন নয়, কেননা একটুখানি চেলে নিলেই এই মতবাদ ধর্মপুঁথিতে লেখা সৃষ্টিতত্ত্বে পরিণত হয়: শুরুতে সৃষ্টি হয়েছিল অনেক রকমের জীব; আজকের পৃথিবীতে শুধুমাত্র তাদেরই অনুরূপ বংশধরদের ভিড়।

অথচ, যেটা খুবই আশ্চর্যের কথা, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কোষতত্ত্ব নামে জীববিজ্ঞানের যে শাখা সেই শাখায়—এবং, অতএব, বংশগতি সংক্রান্ত মতবাদের ক্ষেত্রে—ভাইসম্যানের এই মতবাদই সবচেয়ে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। ভাইসম্যানের মতের সঙ্গে আরো একটি পুরনো মতবাদকে নতুন করে আবিষ্কার করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যিনি সেই মতবাদের স্রষ্টা তাঁর নাম গ্রিগর মেণ্ডেল। ভাইসম্যানের মতের সঙ্গে মেণ্ডেলের মতবাদটা খুব লাগসই ভাবে খাপ খেয়ে যায়। শুধু ভাইসম্যান আর মেণ্ডেলের মতবাদকে জুড়ে দেওয়া নয়, সেই সঙ্গে

একটি বাস্তব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নজির দেওয়াও, এই আবিষ্কারের নাম ক্রোমোসোম্। ভাইসম্যান আর মেণ্ডেলের মতবাদ আর সেই সঙ্গে ক্রোমোসোম নামের বাস্তব বৈজ্ঞানিক বস্তুর নজির—এই তিনে মিলে আধুনিক জীববিদ্যায় যে মতবাদ দাঁড় করানো হয়েছে তারই নাম "বংশগতি সংক্রান্ত ক্রোমোসোমবাদ", কিম্বা আরো ছোট করে, "ক্রোমোসোমবাদ"।

"ক্রোমোসোমবাদের" বিরুদ্ধেই সোভিয়েট জীববিদ্যার প্রধান অভিযান। তার মানে এই নয় যে সোভিয়েট জীববিদ্যা ক্রোমোসোম নামের চাক্ষুষ ও বাস্তব বস্তুটিকে অস্বীকার করতে চায় কিংবা অস্বীকার করতে চায় বংশগতির সঙ্গে ক্রোমোসোম বলে জিনিসটার যোগাযোগ। লাইসেনকো স্পষ্ট ভাষাতেই এ কথা উল্লেখ করছেন এবং সেই সঙ্গেই বলছেন তাঁর আসল অভিযান হল "ক্রোমোসোমবাদের" বিরুদ্ধে। ক্রোমোসোমবাদ বলতে একটি নির্দিষ্ট আধা-দার্শনিক মতবাদকে বোঝায় —তার বাইরের দিকটার নজির আছে ক্রোমোসোম নামের বাস্তব এবং বৈজ্ঞানিক এক বস্তুর, কিন্তু ভিতর দিকটায় লুকোনো আছে ভাইসম্যান আর মেণ্ডেলের আধা-ধার্মিক, আধা-দার্শনিক মতবাদ।

গ্রেগর জোহান্ মেণ্ডেল। ১৮১২—১৮৮৪। অস্ট্রিয়ার রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত। কিন্তু পুরোহিত হিসেবে তাঁর আসল খ্যাতি নয়, সে-খ্যাতি হল সাবেকী বংশগতি বিদ্যা বা জেনেটিক্স্-এর জন্মদাতা হিসেবে। মঠের বাগানে তিনি দীর্ঘ দিন ধরে বংশগতির নিয়ম নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। পরীক্ষার প্রাণী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন মটরশুঁটি গাছ। আর তাছাড়া, মেণ্ডেলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, পরীক্ষার সময় সব রকম

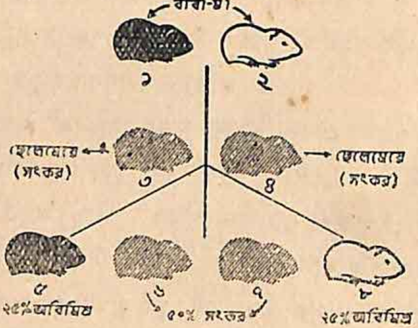
লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখবার চেষ্টা না করে তিনি এক একটি বিশিষ্ট ও নির্বাচিত গুণের উপর নজর আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। যেমন ধরুন, একটা কড়াই শুঁটি গাছের তো নানান রকম লক্ষণ হতে পারে: আকৃতির দিক থেকে দীর্ঘ বা খর্ব, ফুলের রঙের দিক থেকে নানান রকম, ফলের দিক থেকে নানান রকম। সব রকম গুণের উপর এক সঙ্গে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা না করে মেণ্ডেল চেষ্টা করলেন এক একটি বাছাই করা গুণের উপর দৃষ্টি রেখে পরীক্ষা করবার। যেমন ধরা যায়, আকৃতির দিক থেকে দুটি লক্ষণ, খর্ব আর দীর্ঘ। মেণ্ডেলের প্রশ্ন হল একটি দীর্ঘ এবং একটি খর্ব গাছ মিলে যদি কোন সন্তানের জন্ম দেয় তাহলে বংশগত সূত্রে সন্তানের মধ্যে কোন্ লক্ষণটা প্রকাশিত হবে, খর্বের লক্ষণ না দীর্ঘের লক্ষণ?

অনেক পরীক্ষার পর মেণ্ডেল কয়েকটি মূল সূত্রে পৌঁছতে পেরেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তগুলির একটা মোটামুটি খসড়া করা যাক। মেণ্ডেলের মতে বংশগত সূত্রে সন্তানের মধ্যে যে সব গুণ সঞ্চারিত হয় সেগুলির প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে ও স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হয়। অতএব, বংশগত গুণ বলতে আলাদা আলাদা ভাবে কতকগুলি বিশিষ্ট গুণকে বুঝতে হবে। যেমন ধরা যায়, লাল চুল নামের একটা লক্ষণ, কালো চুল নামের আর একটা লক্ষণ; খোঁচা চুল নামের একটা লক্ষণ, কোঁকড়া চুল নামের আর একটা লক্ষণ। প্রত্যেকটি লক্ষণই হল স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। তাই, বাবার চুল যদি লাল আর খোঁচা হয় এবং মার চুল যদি কালো আর কোঁকড়া হয় তাহলে সন্তান তার বাবার কাছ থেকে লাল চুলের লক্ষণ এবং মার কাছ থেকে কোঁকড়া চুলের লক্ষণ পেতে পারে, অর্থাৎ তার চুল কোঁকড়া আর লাল হতে পারে। লাল

নামের রঙ্ একটা লক্ষণ আর কোঁকড়া নামের গড়ন আর একটা লক্ষণ, দুটো লক্ষণ আলাদা ভাবে পাওয়া। মেণ্ডেলের মতে বংশগত লক্ষণ-গুলিকে এই রকম আলাদা আলাদা ভাবে বোঝবার চেষ্টা করা দরকার। এই সব স্বতন্ত্র ও স্বয়ং সম্পূর্ণ লক্ষণগুলি কোন মতেই মিশ খেয়ে একটা মিশ্রিত লক্ষণে পরিণত হয় না। যেমন ধরা যায়, একটি দীর্ঘ আকৃতির গাছ এবং একটি খর্ব আকৃতির গাছ—এই দুটি গাছ মিলে একটি সংকর গাছের জন্ম দিল। সংকর গাছটির মধ্যে দীর্ঘ আর খর্ব দুটি লক্ষণ মিলে মাঝারি আকৃতি নামের কোন তৃতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। মেণ্ডেলের মতে এই দুটি লক্ষণই স্বতন্ত্রভাবে ও স্বাধীনভাবে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। তার মানে কিন্তু দুটিই যে একসঙ্গে সন্তানের মধ্যে ফুটে উঠবে সে কথা নিশ্চয়ই নয়। মেণ্ডেল বলেন, সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত এই দুটি লক্ষণের মধ্যে একটি লক্ষণ চেষ্টা করবে অপরটিকে দাবিয়ে রেখে আত্মপ্রকাশ করতে। যেটি পারবে অপরটিকে দাবিয়ে রেখে আত্মপ্রকাশ করতে সেটি হবে প্রকট লক্ষণ; অপরট কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে না, টিকে থাকবে প্রচ্ছন্নভাবে। প্রচ্ছন্ন গুণটির পক্ষে উত্তর বংশের মধ্যে ভবিষ্যতে ফুটে বেরুবার সম্ভাবনা। এইভাবে অজস্র বংশগত লক্ষণ রয়েছে, প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রত্যেকটিই স্বাধীন, প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র; বংশ পরম্পরার মধ্যে এই সব গুণগুলির কোনটি অপর কোনটির সঙ্গে সংযুক্ত হয় আবার কখনো বিযুক্ত হয়; অর্থাৎ এই সংযোগ বিয়োগ ছাড়া বংশ পরম্পরার মধ্যে নতুন কোন গুণ দেখা দিতে পারে না।

মেণ্ডেলীয় মতবাদের সঙ্গে ভাইসম্যানের আত্মীয়তা খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। কেননা মেণ্ডেলীয় মতবাদেরও স্পষ্টতম ব্যঞ্জনা হল

স্থিতিবাদ, শাশ্বতবাদ, সনাতনবাদ : বংশগতি বলে ব্যাপারটা কতকগুলি যেন অনাদি ও শাশ্বত টুকরো গুণের সংযোগ-বিয়োগের খেলা মাত্র। তার মানে জীবজগতের পরিবর্তনে কোন মৌলিকতা নেই। ঘুঁটি নিয়ে জোড়-বিজোড় খেলবার সময় যে রকম পরিবর্তন এ-পরিবর্তন তার চেয়ে



মেণ্ডেলের বংশগতি-সূত্রের নমুনা। একটি কালো গিনিপিক্ আর একটি সাদা গিনিপিক্ মিলে যে সন্তানের জন্ম দিলো তারা সবাই সংকর; তাদের আবার যে বাচ্চা হবে সেগুলির মধ্যে ২৫% শুদ্ধ সাদা, ২৫% শুদ্ধ কালো ৫০% সংকর। মনে রাখতে হবে, সংকরগুলির মধ্যে কোনো মাঝারি গুণের প্রকাশ নয়; প্রকট গুণ প্রচ্ছন্ন গুণকে দাবিয়ে রেখেছে মাত্র, কিন্তু দুরকম গুণই রয়েছে।

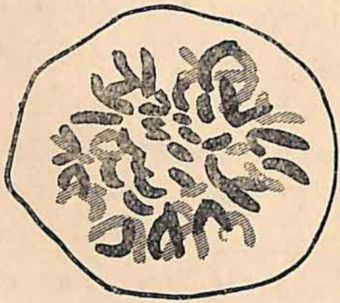
গুরুতর কোন পরিবর্তন নয়। ঘুঁটিগুলো তো সত্যিই বদলায় না, মুঠোর মধ্যে কোন্ ঘুঁটির সঙ্গে কোন্ ঘুঁটি আসবে শুধু তারই সম্ভাবনায় যা অদল বদল। মেণ্ডেলের মতবাদে পরিবর্তনের স্থান এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। শুধু জীবজগতের অবিরাম পরিবর্তনকে অস্বীকার করা নয়;

মেণ্ডেলের মতবাদ অনুসারে বংশগতির ব্যাপারে পারিপার্শ্বিকের ক্ষীণতম প্রভাবও দেখতে পাবার কথা নয়। অর্থাৎ ভাইসম্যানের মতবাদের মতই মেণ্ডেলের মতবাদের মধ্যেও ডারউইন-লেমার্ক আবিষ্কৃত মূল সত্যগুলির ঠাঁই নেই একটুও।

১৮৬৫-তে মেণ্ডেল বিদগ্ধ সমাজের কাছে তাঁর এই মতবাদ পেশ করেছিলেন। কিন্তু তখন এই মতবাদ নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে কোন উৎসাহ দেখা যায়নি। মেণ্ডেলের মৃত্যুর প্রায় বছর ষোলো পরে, অর্থাৎ ১৯০০-তে তিনজন জীবতত্ত্ববিদ যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন মেণ্ডেলের মতবাদ আর ক্রোমোসোম নামের বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক বস্তুটির ঘাড়ে এই মতবাদের বোঝা চাপিয়ে জীবতত্ত্বের ক্ষেত্রে সুরু হল প্রবল হৈ-চৈ। জন্ম হল "ক্রোমোসোমবাদ" নামের বংশগতি সংক্রান্ত এক মতবাদ, যে মতবাদের বিরুদ্ধে লাইসেনকোর অভিযান।

ক্রোমোসোম বলে জিনিসটা ঠিক কী? জীবকোষকে ঠিকমত রঙে চুপিয়ে অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে একটা জায়গায় রঙ ধরে বেশী। কোষের এই অংশকে বলা হয় কোষকেন্দ্র, বাকি অংশটাকে বলে কোষবস্তু। কোষকেন্দ্রের মধ্যে আবার একটা জিনিস দেখতে পাওয়া যায়, যে-জিনিসটায় রঙ ধরে সবচেয়ে গাঢ়ভাবে। এই জিনিসটার নাম দেওয়া হয় ক্রোমেটিন; নামটা নেওয়া হয়েছে গ্রীক শব্দ 'ক্রোম' থেকে। ক্রোম মানে হল রঙ। কোষবিভক্তির সময়, অর্থাৎ একটি কোষ ভেঙে যখন দুটি কোষের জন্ম হয় তখন, দেখতে পাওয়া যায় এই ক্রোমেটিনের আকৃতি ক্রমশ বদলে গিয়ে খুব সূক্ষ্ম সুতোর কয়েকটি টুকরোর মত হয়ে যাচ্ছে, এই সূক্ষ্ম সুতোর টুকরো মত জিনিসগুলির নাম দেওয়া হয় ক্রোমোসোম।

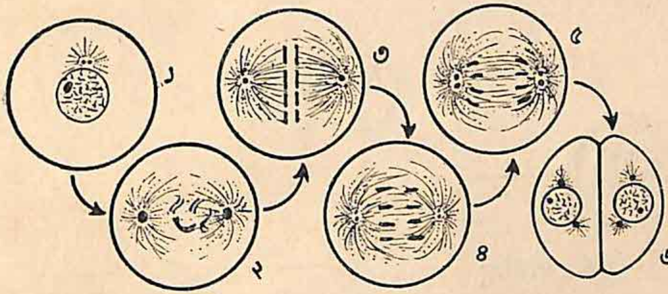
প্রত্যেকটি জীবদেহই কোষ দিয়ে গড়া, একটি জীবদেহের মূলে যত কোষ তার প্রত্যেকটির মধ্যেই এই ক্রোমোসোম সংখ্যা সমান। (কেবল জনন-কোষ ছাড়া। জননকোষের কথা একটু পরেই উঠবে।) যেমন ধরা যায় মানুষের দেহ : মানুষের দেহে প্রত্যেকটি কোষের মূলেই রয়েছে ৪৮টি করে ক্রোমোসোম, কিম্বা যা একই কথা, ২৪ জোড়া ক্রোমোসোম। শুধু চেহারার দিক থেকে নয়, আকৃতি-প্রকৃতির দিক থেকেও প্রতিটি কোষের অন্তর্গত ক্রোমোসোমগুলি সমতুল্য ; যেমন মানুষের দেহে এ-কোষের মধ্যে যে রকম ২৪ জোড়া ক্রোমোসোম ও-কোষের মধ্যেও সেই রকমই ২৪ জোড়া ক্রোমোসোম। কী করে এমনটা সম্ভব হল ?



মানুষের শরীরে প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে এই রকমের ক্রোমোসোম। অন্য জীবের দেহকোষ অন্য রকম।

তার কারণ মূল ভ্রূণকোষ (জাইগোট) বিভক্ত হতে হতে, বিভক্ত হতে হতে, অনেক অজস্র কোষে পরিণত হয়েছে এবং সেই অজস্র কোষ সমষ্টিই আমাদের দেহ। এবং দেখা গিয়েছে, একটি কোষ বিভক্ত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হবার সময় তার ভিতরকার ক্রোমো-সোমগুলি যেন লম্বালম্বিভাবে চিরে যায় এবং একটি চিরে গিয়ে যে-দুটি ক্রোমোসোমে পরিণত হয় সেই দুটি ক্রোমেসোমই মূল ক্রোমোসোমটির অনুরূপ। তারপর, এই ভাবে চিরে যাবার পর, চেরা টুকরো দুটির

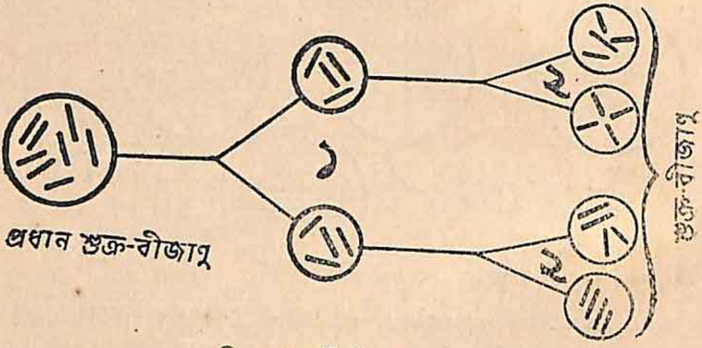
এক একটি করে চলে যায় নতুন দুটি কোষের কেন্দ্রের মধ্যে। তাই মূল কোষটির কেন্দ্রে যে কটি এবং যে রকমের ক্রোমোসোম নতুন দুটি কোষের কেন্দ্রেও সেই কটি এবং সেই রকমের ক্রোমোসোম। অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে বংশপরম্পরাগত ভাবে কী করে একই সংখ্যক ক্রোমোসোম মানুষের দেহে (বা অন্যান্য জীবদেহে) বর্তমান থাকতে পারে? কেননা, পিতৃদেহের একটি কোষ এবং মাতৃদেহের একটি কোষ (শুক্রবীজাণু এবং ওভা) এই দুয়ে মিলিত হয়ে তবেই



কোষ-বিভক্তির নমুনা। এই ধরনের কোষ-বিভক্তিকে বলা হয় মিটোসিস্। মধ্যে মোটা কালো কালো দাঁড়িগুলি দিয়ে ক্রমোসোম বোঝানো হয়েছে।

তো মূল ভ্রূণকোষের (জাইগোট) শুরু—এই ভ্রূণকোষ বিভক্ত হতে হতে শেষ পর্যন্ত সন্তানের শরীর গড়ে তোলে। পিতৃদেহের প্রতি কোষে যদি ২৪ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে এবং মাতৃদেহের প্রতি কোষে যদি ২৪ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে তাহলে সন্তানের দেহ কোষে তো ৪৮ জোড়া ক্রোমোসোম দেখা দেবার কথা এবং এই ভাবে বংশ পরম্পরায় ক্রোমোসোমের পক্ষে ক্রমাগতই দ্বিগুণ সংখ্যক হয়ে

যাবার কথা। কিন্তু তা হয় না। তার কারণ. যেগুলিকে বলা হয় জননকোষ (অর্থাৎ শুক্রবীজাণু এবং ওভা, যেগুলির দরুন সন্তানের জন্ম) সেগুলির ভিতরে ক্রোমোসোম সংখ্যা শরীরের বাকি কোষগুলির ক্রোমোসোম সংখ্যার ঠিক অর্ধেক। মানুষের দেহে বাকি সব কোষের মধ্যে ২৪ জোড়া করে ক্রোমোসোম, কিন্তু জননকোষগুলির মধ্যে ২৪টি করে ক্রোমোসোম। তাই দুটি জননকোষ মিলে যখন একটি ভ্রূণকোষ তৈরী হল তখন সেই ভ্রূণকোষের মধ্যে আবার ২৪ জোড়া ক্রোমোসোম।



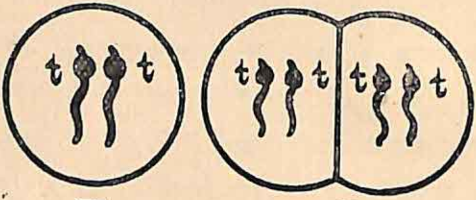
রিডাকসন-ডিভিশনের নমুনা
১ : রিডাকসন-ডিভিশন, ২ : মিটোসিস্

জননকোষগুলির মধ্যে ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক কেন? তার কারণ যে মূল কোষ বিভক্ত হতে হতে ক্রমশ অসংখ্য জননকোষে পরিণত হয় সেই মূল কোষ যখন প্রথম বিভক্ত হয় তখন তা সাধারণ কোষ-বিভক্তির নিয়ম মেনে চলে না। তাই সাধারণ কোষ-বিভক্তির নাম দেওয়া হয় মিটোসিস, জননকোষের এই প্রথম বিভক্তির নাম দেওয়া হয় রিডাকসন-ডিভিশন। রিডাক্সান ডিভিশনের বেলায়

প্রতিটি ক্রোমোসোম চিরে গিয়ে দু-খণ্ডে পরিণত হয় না, তার বদলে সেগুলির জুড়ি ভেঙে যায়। যেমন, রিডাক্সান ডিভিশনের বেলায় মানুষের দেহকোষের ২৪ জোড়া ক্রোমোসোমের জুড়ি ভেঙে গিয়ে নতুন কোষ দুটির মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে ২৪টি করে ক্রোমোসোম চলে যায়। অবশ্য তারপর, এই নতুন দুটি জননকোষ যখন আবার বিভক্ত হতে থাকে, তখন তারা সাধারণ কোষ-বিভক্তির নিয়ম মেনেই বিভক্ত হয়, যে নিয়মের নাম হল মিটোসিস।

আধুনিক জীববিদ্যায় এই হল ক্রোমোসোম-সংবাদ। এই সংবাদের উপরই ভাইসম্যান্ মেণ্ডেলের শাশ্বতবাদকে চাপিয়ে দিয়ে আধুনিক জীববিদ্যায় গড়া হয়েছে "ক্রোমোসোমবাদ" নামের একটি বিশেষ মতবাদ। ভাইস্‌ম্যান এবং মেণ্ডেল দুজনেই বংশগতির মূলে অনাদি অনন্ত কিছুকে সন্ধান করতে চেয়েছিলেন : ক্রোমোসোমবাদীরা মনে করলেন এই ক্রোমোসোমের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সেই অনাদি-অনন্তের বাস্তব ভিত্তি। কিন্তু শুধু অনাদি-অনন্ত হলেই হবে না; সেগুলির পক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন হওয়ার দরকার : বাকি দেহটার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বাকি দেহটায় যে সব নতুন গুণের সঞ্চার সেই গুণগুলির সঙ্গেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই। অতএব কল্পনা করে নেওয়া হল এই ক্রোমোসোমের মধ্যেই রয়েছে কতকগুলি অতি-অণুবীক্ষণ বস্তুবিন্দু; এক একটি বস্তু-বিন্দুর দরুনই এক এক রকম বংগগত লক্ষণ—মেণ্ডেলীয় স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ বংশগত লক্ষণ। সেই কল্পিত বস্তুবিন্দুগুলির নাম দেওয়া হল "জিন" : অণুবীক্ষণের সাহায্যে যে সরু-সুতোর মত ক্রোমোসোমকে দেখতে পাওয়া যায় সেই ক্রোমোসোম আর কিছুই নয় এই জিন-এর

যেন এক ছড়া করে মালা। প্রতিটি ক্রোমোসোমে অসংখ্য জিন, এক একটি জিন এক এক রকম চাঁচা-ছোলা বংশগত লক্ষণের জন্য দায়ী। এই হল "ক্রোমোসোমবাদ" : ক্রোমোসোমের মধ্যে মেণ্ডেল কথিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নির্বিকল্প চাঁচা-ছোলা বিভিন্ন বংশগত লক্ষণের জন্যে দায়ী বিভিন্ন বস্তুবিন্দুর কল্পনা। ক্রোমোসোমের মৃত্যু নেই, জন্ম নেই : এক বংশ থেকে আর এক বংশের মধ্যে শাশ্বত ক্রোমো-



ক খ

একটি ক্রোমোসোম চিরে দুটি ক্রোমোসোম, দুটি চিরে তাই চারটি। কল্পনা করা হচ্ছে যে প্রত্যেকটি ক্রোমোসোমের যেখানে যে-জিন, চেরা-ক্রোমোসোমের সেই স্থানেও সেই জিন। ছবিতে কল্পিত দুটো জিন-কে t চিহ্ন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা।

সোমের সঞ্চার। "জিন" দিয়ে গড়া এই ক্রোমোসোম ; জিনগুলিও তাই অনাদি অনন্ত। বংশগতির মূলে এ ছাড়া আর কিছুই নেই। ফলে বংশগতির ধারায় অভিনবের আবির্ভাব অসম্ভব, সম্ভব নয় প্রাণী জগতে কোন মৌলিক পরিবর্তন। বিভিন্ন "জিন"-এর বিভিন্ন রকম সমাবেশের ফলে যতটুকু অভিনব সম্ভব ততটুকুর চেয়ে বেশী অভিনবর জন্যে জায়গা নেই প্রণীজগতে। তাই প্রাণীজগতকে পরিবর্তন করবার ব্যাপারে সনাতন জিনগুলি নিয়ে চালাচালি করবার চেয়ে

বেশী কিছু করবার মত হাত নেই আমাদের। আর প্রাণীজগতের উপর পারিপার্শ্বিক দুনিয়ার যে প্রভাব তা নেহাতই সাময়িক, তুচ্ছ অবান্তর; অবশ্য নেহাৎ কালেভদ্রে কোন কোন প্রাণীদেহে জীবকোষের ক্রোমোসোমে কোন একটি জিন হয়তো নষ্ট হতে পারে বা বদলে যেতে পারে; কিন্তু সে হল নেহাতই দুর্লভ দৈব।

অবশ্যই, ক্রোমোসোম বলে জিনিসটা বৈজ্ঞানিক বাস্তব। কিন্তু জিনকে সেই অর্থে বৈজ্ঞানিক বাস্তব বলবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আসলে জিন হল মেণ্ডেলীয় মতবাদের দাবিতে ক্রোমোসোমের অন্তর্গত স্থির ও শাশ্বত কিছুকে মেনে নেবার চেষ্টা। এবং সেই রকম একটা কিছুর সত্তা যদি মেনে নেওয়াই হয় তাহলে জীবতত্ত্ববিদের প্রধান দায়িত্বটাও যায় বদলে। ডার- উইনের ধারণা ছিল জীবতত্ত্বের আবিষ্কার প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাবকে অসীম করে তুলবে: "আমরা দেখতে পাব পরম্পরাগত সূক্ষ্ম পরিবর্তন সংগ্রহ করবার ব্যাপারে মানুষের শক্তি কী অসামান্য।" কিন্তু জীববিদ্যায় ক্রোমোসোম-বাদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৈজ্ঞানিকের মন থেকে এ-আদর্শটা মুছে যাবারই কথা। প্রাণীজগতের সমস্ত পরিবর্তনই যদি কতকগুলি অনন্ত জিন-এর চালাচালি খেলা মাত্র হয় তাহলে প্রাণীজগৎ নিয়ে মানুষের পক্ষে করবার রইল **কী?** বৈজ্ঞানিক পরিণত হল দ্রষ্টা মাত্রে: দ্রষ্টা হিসেবে শাশ্বত জিনের লীলাখেলা দেখা, তার বেশী কিছু নয়।

দেখা গেল বংশগতি বিদ্যায় জীববিজ্ঞানীদের কাজ শুধু এইটুকুতেই পরিণত হতে চলেছে! ড্রসোফিলিয়ার (এক রকম মাছি) ক্রোমোসোমে কত রকমের জিন আছে তারই কল্পিত হিসেব নিকেষ নিয়ে আধুনিক বংশগতি বিদ্যায় অন্তত চোদ্দ আনা উৎসাহের খরচ।

কিন্তু লাইসেনকো যাঁর আদর্শে প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর আদর্শটা একেবারে অন্য রকমের। তাঁর নাম মিচুরিন। তিনি বলতেন : প্রকৃতি দয়া করে আমাদের কাছে কবে কোন্ দান পাঠাবে সেই আশায় বসে থাকতে আমরা রাজি নই, আমরা চাই প্রকৃতির কাছ থেকে নিজেদের চাহিদা আদায় করে নিতে।



মিচুরীন

লাইসেনকো যে সমাজের মানুষ সেই সমাজের আদর্শটাও অন্য রকমের। সেখানে মানুষ পণ করেছে পৃথিবীকে বদল করে মানুষের জীবন শান্তি আর প্রাচুর্যে পূর্ণ করে তুলতে। তারা তাই পাহাড় গুঁড়ো করে নদীর স্রোত টেনে আনে মরুভূমির বুকে, মরা বালির রাজ্য ঝলমল করে ওঠে আদিগন্ত সোনালী ফসলের বন্যায়। তাই, কোন্ মাছির কোষে কত রকমের জিন আছে তারই কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকা এই সমাজের বৈজ্ঞানিকের পক্ষে শোভা পায় না; তাঁর চিন্তা হল কেমন করে প্রাণীজগতের পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে প্রকৃতিকে জয় করা যায় অনেক অনেক বেশী।

ক্রোমোসোমবাদ। অর্থাৎ, ক্রোমোসোমগুলিকে অতি সূক্ষ্ম এক রকম পদার্থবিন্দুর মালা বলে কল্পনা করা। এই তথাকথিত পদার্থবিন্দুর নাম দেওয়া হয়েছে জিন এবং ধরে নেওয়া হয়েছে প্রতিটি জিন স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি বংশগত গুণের সনাতন বাহক। অর্থাৎ ক্রোমোসোম নামের চাক্ষুষ—অতএব বাস্তব—পদার্থের উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ বংশগত লক্ষণ সম্বন্ধে মেণ্ডেলীয় মতবাদ এবং ভাইসম্যানের সনাতনবাদকে চাপিয়ে দেবার আশায় এই ক্রোমোসোমগুলির মধ্যেই এক রকম বাস্তব পদার্থের কল্পনা। এই হল ক্রোমোসোমবাদ। মনে রাখতে হবে, ক্রোমোসোমবাদ আর ক্রোমোসোম-তথ্য এক কথা নয়। ক্রোমোসোমবাদ হল বংশগতি সংক্রান্ত নানান রকম সম্ভব মতবাদের মধ্যে একটি প্রমাণ-সাপেক্ষ মতবাদ মাত্র। ক্রোমোসোম-তথ্য হবে এক বাস্তব জিনিস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য মাত্র। তাই, কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই ক্রোমোসোম-তথ্যকে উড়িয়ে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। অনেকে ভুল করে মনে করেন লাইসেনকো বুঝি ক্রোমোসোমকেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। অবশ্যই সে-কথার কোন মানে হয় না। আসলে,

লাইসেনকোর অভিযান ওই বিশেষ মতবাদটির বিরুদ্ধে, যে মতবাদের নাম হল ক্রোমোসোমবাদ।

লাইসেনকোর সমালোচনা নিয়ে আলোচনা তোলবার আগে এই ক্রোমোসোমবাদের মূল তাৎপর্যগুলি স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার।

প্রথমত, এই মতবাদ অনুসারে প্রাণীদেহের যে-অংশটুকু বংশগত গুণ সঞ্চারের জন্যে দায়ী সেই অংশটুকুর সঙ্গে বাকি প্রাণীদেহের কোন গভীর সম্পর্ক নেই। জননকোষের ভিতরকার ক্রোমোসোম এবং সেই ক্রোমোসোমের ভিতরকার তথাকথিত জিন—বংশগত গুণ সঞ্চারণের জন্যে আর কিছুর কোন রকম দায়িত্ব নেই। জিনগুলি বাকি দেহটার প্রভাবমুক্ত : তাই প্রাণীদেহের পুরোটা জুড়ে যদি কোন বিপুল-গভীর পরিবর্তন দেখা দেয় তাহলে সেই পরিবর্তনের ঢেউ উত্তর-পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছবার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

দ্বিতীয়ত, বংশগতির ব্যাপারটা শুধু যে বাকি দেহটুকুর—অর্থাৎ ঐ তথাকথিত অতি-অণুবীক্ষণ পদার্থগুলি ছাড়া পুরো দেহটুকুরই—ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন তাই নয়, পারিপার্শ্বিক ইতিহাস থেকেও বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত। প্রাণীদেহের পারিপার্শ্বিক জগতে যে-পরিবর্তন প্রাণীজগতকে পরিবর্তিত করবার ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। এই প্রভাবের ফলে কোন প্রাণীর শরীর যদি কোন ভাবে বদলে যায় তাহলে সেই বদলের ইতিহাস ঐ বিশেষ প্রাণীটির ইতিহাসের সঙ্গেই সমব্যাপ্ত হবে। অর্থাৎ, ওই পরিবর্তনের কোন রেশ তার সন্তানাদির মধ্যে ফুটে বেরুবার সম্ভাবনা থাকবে না। তার মানে, অর্জন করা গুণ বংশগত সূত্রে উত্তর পুরুষের মধ্যে সংক্রামিত হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

তৃতীয়ত, ক্রোমোসোমবাদের অনিবার্য পরিণতি সনাতনবাদে। এক

একটি নির্দিষ্ট জিন এক একটি নির্দিষ্ট বংশগত গুণের বাহক, এবং এই জিনগুলি সনাতন ও শাশ্বত। তাই সন্তান দেহে কী কী লক্ষণ দেখা দেবে তা নির্দিষ্ট করে দেয় পিতৃ জননকোষ আর মাতৃ জননকোষের জিনগুলি মিলে। জোড় বিজোড় খেলবার সময়ে যে রকম কতকগুলি স্থির ও নিশ্চল ঘুঁটি নিয়ে শুধুমাত্র সাজানো-গোছানোর ব্যাপারে রকমারি, তার বেশী কিছু নয়। অর্থাৎ, মৌলিক পরিবর্তন নয়; আসল অদল-বদল নয়। বংশগতির বেলাতেও এই রকমই কতকগুলি স্থির আর নিশ্চল গুণের রকমারি সমন্বয় ; কিন্তু শুধু ওইটুকুই।

তাছাড়া, এই ক্রোমোসোমবাদ জীববিজ্ঞানীকে প্রয়োগজীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিতে বাধ্য। জীবজগতে যেটুকু অদল-বদল সেটুকু যদি কতকগুলি সনাতন জিন নিয়ে প্রকৃতির পক্ষে নেহাতই জোড়-বিজোড় খেলা হয় তাহলে বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই ঘুঁটি খেলার দ্রষ্টামাত্র,—বা বড় জোর শুধু এই ঘুঁটি খেলার কিছুটা অংশিদার মাত্র,— হয়ে থাকা ছাড়া আর কোন সম্ভাবনা নিশ্চয়ই থাকে না। অর্থাৎ, প্রাণীজগতে কোন রকম গভীর আর মৌলিক পরিবর্তন প্রবর্তন করায় বৈজ্ঞানিকের কোন হাত থাকতে পারে না। বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই ভাবে প্রয়োগ-বিচ্যুত হবার আরো একটা বিপদের দিক আছে, যদিও সেই দিকটা প্রধানতই দার্শনিক দিক। সুস্থ প্রয়োগের সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক ততক্ষণ সুস্থ বস্তুবাদী দৃষ্টি, প্রয়োগ-বিচ্যুত হলে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ভাববাদ আর চেতনকারণবাদ দিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে চায়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে দখল করতে চায় বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ প্রচ্ছন্ন ধর্মতত্ত্ব। ক্রোমোসোমবাদের মহাগুরু ভাইস্‌ম্যান্‌-এর ধর্মমূলক উৎসাহটা অবশ্যই প্রকট। কিন্তু আধুনিক ক্রোমোসোমবাদীরা অমন সজ্ঞানে ধর্মের দিকে

আকৃষ্ট হতে চাইবেন না নিশ্চয়ই। তবু তাঁদের মতবাদের মধ্যে ভাববাদ ও চেতনকারণবাদ—যা শেষ পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন ধর্মমোহই—অনেকখানি জায়গা করে নিয়েছে।

এবার লাইসেনকোর মূল বক্তব্যটুকু বর্ণনা করা যাক। মনে রাখতে হবে, পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য দিয়েই তবে তিনি নিজের মতবাদ পেশ করেন। আরো মনে রাখতে হবে, অনেক দিন আগে থাকতেই - লাইসেনকোর সমালোচনা নিয়ে পৃথিবীজোড়া কোলাহল শুরু হবার অনেক আগে থাকতেই—জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন অনেক ঘটনা সাবেকী জীববিজ্ঞানীদেরই চোখে ধরা পড়েছিল যে-ঘটনাগুলি ঐ ক্রোমোসোমবাদের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায় না। কিন্তু ক্রোমোসোমবাদ দিয়ে এই জাতীয় দৃষ্টান্তকে ব্যাখ্যা করা যায় না দেখেও সাবেকী জীববিজ্ঞানীরা ক্রোমোসোমবাদকে শুধরে নেবার কোন তাগিদ দেখান নি। বরং, ওই ধরনের সব ঘটনাকে তাচ্ছিল্য করবার আগ্রহটাই তাঁদের মধ্যে বেশী। যেন এই ধরনের ঘটনা প্রকৃতির মধ্যে খাপছাড়া আর বেয়াড়া ধরনের ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকৃতিতে নানান রকমের অঘটন তো ঘটেই। তাই এই সব ঘটনাগুলি আসলে প্রাকৃতিক ঘটনাই নয়, অঘটন মাত্র। ঘটনাগুলির নমুনা একটু পরেই উল্লেখ করব। আপাতত যেটা লক্ষ্য করবার বিষয় সেটা হল ক্রোমোসোমবাদের প্রতি বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকদের মোহ: মতবাদটার সঙ্গে চোখে দেখা ব্যাপারগুলো যদি খাপ নাও খায় তাহলে বরং ওই চোখে-দেখা ব্যাপারগুলোকেই তাচ্ছিল্য করতে হবে, কিন্তু মতবাদটাকে বদল করা চলবে না। কিন্তু কেন এমন মোহ? জবাবটা পাওয়া যায় সমাজবিজ্ঞানে। আসলে এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই বুর্জোয়া

বৈজ্ঞানিকদের আশ্রয় দেয়, প্রতিপালন করে। তাই, মতবাদের বেলায় তাঁরা জেনে-শুনেই হোক আর না-জেনে-শুনেই হোক এই সমাজব্যবস্থার পক্ষে জুৎসই দৃষ্টিভঙ্গির সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হন। আজকের সমাজে মালিকশ্রেণীর একেবারে যেটা মনের কথা সেই কথার সঙ্গে এই ক্রোমোসোমবাদের ঘনিষ্ঠতা অস্পষ্ট নয়। কল্যাণময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে পারিপার্শ্বিককে পরিবর্তন করবার প্রসঙ্গটা ক্রোমোসোমবাদের তরফ থেকে অবান্তর ও অবাস্তব হয়ে পড়তে বাধ্য, তাই বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কোলাহলকে বিজ্ঞানের অজুহাত দেখিয়ে বন্ধ করবার সম্ভাবনা। তাছাড়া, ধর্মমোহের মধ্যে জন্মগত জাতিভেদের যে-কথা সেই কথাই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে নতুন করে, এবং অতি-সূক্ষ্ম আকারে, এই ক্রোমোসোমবাদের মধ্যেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক মানুষের সমস্ত গুনাগুণ আদিকাল থেকেই পূর্বপুরুষদের জিন পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে আসছে : তাই মালিকের বংশধর মালিক হবে, এই যেন প্রকৃতির বিধান! ফ্যাসিস্ট জাতিবাদের সঙ্গেও তাই ক্রোমোসোমবাদের দারুণ ঘনিষ্ঠতা।

দুনিয়াকে বদল করবার ব্যাপারে জনগণকে আগ্রহ-ভ্রষ্ট করা। চেষ্টা করে অর্জন করা গুণকে তুচ্ছ করা, জোর দেওয়া সনাতন বংশ-গত লক্ষণের উপরই। এই হল ক্রোমোসোমবাদের রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা, যে ব্যঞ্জনা শ্রেণী সমাজে শোষক শ্রেণীর একেবারে মনের মত ব্যঞ্জনা।

কিন্তু যে সামাজিক পটভূমিতে লাইসেনকোর গবেষনা সেই পটভূমির তাগিদ একেবারে অন্যরকম। সোভিয়েট বিপ্লব শ্রেণী শোষণের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে, প্রেরণা এনেছে পুরনো পৃথিবীকে বদল

করে প্রাচুর্যে টলোমল এক নতুন পৃথিবী গড়বার। এই গড়বার কাজে বিজ্ঞানই হবে মানুষের কাছে অদ্বিতীয় হাতিয়ার। বিজ্ঞানের প্রয়োগ শুধু ফলিত শিল্পের ক্ষেত্রে নয়, কৃষির ক্ষেত্রেও। তাই শুধু কল-কারখানার ব্যাপারেই জার আমলের রাশিয়ার সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার আকাশ পাতাল তফাৎ নয়, চাষবাসের ক্ষেত্রেও যে তফাৎ সেই তফাতের কথা শুনতে প্রায় রূপকথার মত বিস্ময়কর মনে হয়। আগেকার দিনে টুকরো জমিতে একা চাষী যে রকম লাঙল দিত আজকের সোভিয়েট ভূমিতে কোথাও আর তা চোখে পড়ে না। তার বদলে বিরাট বিরাট যৌথ খামার আর রাষ্ট্র খামার। আজকের সোভিয়েটে কৃষি উৎপাদনের বস্তুত সবটুকুই এই সব খামার থেকে। খামারগুলোর মালিকানা এই ভাবে বদলে যাওয়ার তাৎপর্যটা শুধু এইটুকু ভাবলু তাৎপর্য নয় যে ওখানে দরিদ্র নারায়ণের কপাল থেকে দুঃখের চিহ্ন মোছবার আয়োজন করা হয়েছে। আসলে তার তাৎপর্য হল নানামুখী। ব্যক্তিগত মালিকের ব্যক্তিগত মুনাফার হিসেব খামারগুলির পরিকল্পনাকে সঞ্জীবিত করে না। তার বদলে পুরো দেশজোড়া যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রতিটি খামার তারই অঙ্গ মাত্র। মোট দেশটার জন্যে কতটা জিনিস দরকার তারই হিসেব আর সেই হিসেবের দিকে নজর রেখেই যে-রকম কল-কারখানাগুলোতে উৎপাদন পরিকল্পনা সেই রকমই খামারগুলোতেও। বাজারের দিকে নজর নয়, মানুষের প্রয়োজনের দিকে নজর। তাই, উৎপাদনকে যথাশক্তি বাড়িয়ে যাবার আয়োজন ; এবং এই বাড়িয়ে যাবার চিন্তায় কলা-কৌশলকে যতখানি সম্ভব উন্নততর করার চেষ্টা। সবচেয়ে সেরা যন্ত্রপাতি কৃষির ক্ষেত্রে, খামারগুলিতে সবচেয়ে সেরা সার সরবরাহ

করবার চেষ্টা, এই রকম সব রকম দিক থেকেই। আর তাই মতবাদের দিক থেকেও।

কৃষিবিদ্যা শেষ পর্যন্ত জীববিদ্যারই অন্তর্গত, তাই জীববিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদ। জীববিদ্যার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া মতবাদ—ভাইসম্যান-মেণ্ডেলের মতবাদ—প্রকৃতিকে জয় করবার ব্যাপারে মানুষের চেতনাকে পঙ্গু করে রাখতে চেয়েছিল। অর্থাৎ, মনের দিক থেকে নিরস্ত্র করেছিল মানুষকে। দেশজোড়া পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রকৃতিকে জয় করবার জন্যে যে-হাতিয়ারের দরকার সে-হাতিয়ার শুধুমাত্র কলের লাঙল-জাতীয় কলাকৌশল হলেই চলবে না। মনের দিক থেকেও, মতবাদের দিক থেকেও, দরকার হাতিয়ার। আর, যে-কথা এই সঙ্গেই মনে রাখা দরকার, মতবাদটা যখন হাতিয়ার না হয়, অর্থাৎ মানুষের চেতনা যখন প্রয়োগবিচ্যুত হয়, তখন মতবাদটা আর বৈজ্ঞানিক মতবাদ হয়ে থাকতে পারে না: তার মধ্যে জোটে হাজার রকমের আধ্যাত্মিক জঞ্জাল, তাই শেষ পর্যন্ত মতবাদটার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্যক শত্রুতাই। এই কারণে মতবাদকে হাতিয়ার করে তোলবার তাগিদ মতবাদকে সুস্থ বিজ্ঞান করে তোলবার তাগিদও।

এই জাতীয় হাতিয়ার—মতবাদের দিক থেকে হাতিয়ার, অর্থাৎ সংগ্রামমূলক মতবাদ আর সেই কারণেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মতবাদ—জীববিদ্যার ক্ষেত্রে শোনা গিয়েছিল মিচুরিনের মুখে। প্রকৃতি কবে কৃপা করবে সেই আশায় বসে থাকতে আমরা রাজি নই. আমরা চাই প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের চাহিদা জোর করে আদায় করে নিতে। কিন্তু গাছ-গাছড়া নিয়ে অনেক পরীক্ষার ভিত্তিতে মিচুরিন যখন প্রথম এই মতবাদ পেশ করেছিলেন,—যখন প্রথম দেখালেন বাস্তবিকই

প্রকৃতির কৃপা চেয়ে বসে থাকবার দরকার নেই, মানুষ তার চাহিদা প্রকৃতির কাছ থেকে জোর করে আদায় করতে সত্যিই সক্ষম,—তখনো কিন্তু রাশিয়ার সমাজব্যবস্থায় এ মতবাদকে গ্রহণ করার মত উপযুক্ত জমি তৈরি হয়নি। বরং, জার আমলের রাশিয়ায় চিৎকার শোনা গেল : লোকটা বড় বেশী ঈশ্বরদ্রোহী, খোদার উপর খোদকারি করতে চায়। অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিন এবং স্তালিন স্পষ্টই অনুভব করলেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়বার কাজে এই মতবাদ অমূল্য হাতিয়ার হবে, শুধু এর রাজনৈতিক তাৎপর্যটুকুর খাতিরে নয়, আসলে এর মূলে যে সুস্থ বৈজ্ঞানিক মেজাজের পরিচয় তার খাতিরেও। তাই লেনিন এবং স্তালিনের কাছে মিচুরিনের সাদর সংবধনা।

কিন্তু সমাজবিপ্লব সত্যিই তো রূপকথায় শোনা সোনার-কাঠি নয়, যার স্পর্শে দেশের সমস্ত বৈজ্ঞানিকের মন একেবারে রাতারাতি জেগে উঠবে। অক্টোবর বিপ্লবের পরও অনেক দিন পর্যন্তই, দেশের বহু বৈজ্ঞানিকের মনেই বুর্জোয়া ক্রোমোসোমবাদের ঘোর। এই ঘোর ভাঙবার জন্যে এগিয়ে এলেন লাইসেনকো। দেশের জীববিজ্ঞানীদের মন থেকে ক্রোমোসোমবাদের উর্ণাজালকে ছিন্ন করা হল আর সমাজতন্ত্রের আবহাওয়ায় দেশের জনসাধারণের সঙ্গে যে-হেতু বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক সেই হেতু দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকায় দিনের পর দিন ধরে এই উর্ণাজালকে ছিন্ন করবার সংবাদ পাতার পর পাতা জুড়ে। অবশ্যই লাইসেনকো অনেক বৈজ্ঞানিক ঘটনা পরিদর্শনের আর পরীক্ষার সাক্ষ্য জুগিয়েছেন মিচুরিনের মতবাদকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করবার সময়ে, পেশ করবার সময়ে নিজের মতবাদ। কিন্তু এই সাক্ষ্যগুলি উল্লেখ করবার আগে অন্য কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করা যাক, যে

ঘটনাগুলি সাবেকী জীববিজ্ঞানীদের চোখেই ধরা পড়েছিল কিন্তু সাবেকী জীববিজ্ঞানীদের মেজাজ যেগুলিকে আমল দিতে রাজি হয়নি; এগুলিকে নিছক অঘটন বলে, প্রকৃতির রাজ্যে বেয়াড়াগি বলে, উড়িয়ে দিতে চেয়েছে। যেমন ধরা যায় পি. ব্রিয়েন্-এর (P. Brien) পরীক্ষাগুলির কথা। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে স্পঞ্জ নিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবং সেই পরীক্ষার ভিত্তিতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ভাইসম্যান যে-ভাবে প্রাণীদেহকে দেহবস্তু আর বীজবস্তু এই দু-রকম সম্পূর্ণভাবে পরস্পর সম্পর্কহীন বস্তুতে ভাগ করতে চেয়েছেন তা সম্ভব নয়। তিনি বলছেন: "বীজবস্তু থেকে দেহবস্তুর যে ক্রমবিকাশ তা বিপরীত-মুখীও হতে পারে (অর্থাৎ, দেহবস্তু থেকেও বীজবস্তুর ক্রমবিকাশ সম্ভব)। তাছাড়া বীজবস্তুর পরম্পরায় ছেদ দেখা দেয়।" ব্রিয়েনের ছাত্র হার্লান্ট মীভিস্ (H. Harlant-Meevis) এই পথে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজ নিয়ে আরো খানিকটা অগ্রসর হন এবং ফলাফল যা পান তার সঙ্গে ব্রিয়েনের উপসংহারের আশ্চর্য মিল। এবং মীভিস্ স্পষ্টই দেখতে পেলেন যে জীবদেহের আভ্যন্তরিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিবর্তন এনে জীবজগতের বংশগতিতে অনেক রকম পরিবর্তন সৃষ্টি করা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা হিসেবে মীভিস্ উল্লেখ করেছেন উত্তাপ, আলো-বাতাসের অবস্থা, খাদ্যের সরবরাহ, ইত্যাদি। (১৬) আসলে, উদ্ভিৎ-জগতে মাঝে মাঝে কতকগুলি আচমকা আর খাপছাড়া পরিবর্তন যে দেখা দেয় তা অনেক দিন থেকেই জীববিজ্ঞানীদের চোখে পড়েছে, এই জাতীয় পরিবর্তনের নাম দেওয়া হয় বিপরিণতি বা mutation। 'আচমকা, সমগ্র এবং বংশগত পরিবর্তন' বলে এই বিপরিণতির সংজ্ঞা

দেওয়া হয় এবং পরীক্ষার ফলে দেখতে পাওয়া যায় যে এক্স্‌-রে আলট্রা-ভায়োলেট-রে, উত্তাপ, ইত্যাদির সাহায্যে প্রাণীজগতে ঘন ঘন এই রকম বিপরিণতি সৃষ্টি করা সম্ভব। এই সব দৃষ্টান্তের স্পষ্টতম তাৎপর্য হল, পারিপার্শ্বিককে বদল করে প্রাণীজগতে বংশগত পরিবর্তন সৃষ্টি করা সম্ভব এবং সেই সম্ভাবনা থেকেই ক্রোমোসোমবাদ অপ্রমাণিত হতে বাধ্য। কিন্তু বুর্জোয়া জীববিজ্ঞানের ভাইসম্যান-ভক্তি অতি প্রবল। তার আসল আগ্রহ হল বিপরিণতির নমুনাগুলিকে খাপছাড়া আর দৈব অঘটন বলে প্রতিপন্ন করা। 'এ-জাতীয় অনির্দেশবাদ', লাইসেনকো বিরক্ত হয়ে বলেন, 'বৈজ্ঞানিক ভাবীকথনের পথরোধ করে।' তিনি দাবি করেন, 'বিজ্ঞান হল দৈবের শত্রু' এবং এই কথাটি বৈজ্ঞানিক সহজবুদ্ধি-মাত্র হওয়া উচিত হলেও বুর্জোয়া জীববিজ্ঞানীদের পক্ষে লাইসেনকোর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে অসীম আগ্রহ।

শুধু বিপরিণতির দৃষ্টান্তই বা কেন? সাবেকী জীববিজ্ঞানেরই আরো নানান পরীক্ষা ক্রোমোসোমবাদের দুর্বলতাকে অনেক দিন আগে থাকতেই প্রকাশ করে দিয়েছে। নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যায় হর্টাডিয়াম (S. Hortadium) সী-আর্চিন নামের সামুদ্রিক জীব নিয়ে যে-সব পরীক্ষা করেছেন সেগুলির কথা। এঁর পরীক্ষার ফলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েছে যে জীবকোষের মধ্যেকার কেন্দ্রবস্তুটুকু ছাড়াও—অতএব ক্রোমোসোমগুলি ছাড়াও, কেননা ক্রোমোসোমগুলি ওই কেন্দ্রবস্তুটুকুর মধ্যেই বর্তমান—দেহবস্তুটুকুর পক্ষেও বংশগত গুণ সঞ্চারণের ব্যাপারে প্রচুর অবদান রয়েছে! (১৭) এই জাতীয় পরীক্ষা ক্রোমোসোমবাদকে স্পষ্টই অপ্রমাণ করে। কিন্তু সাবেকী জীবতত্ত্ববিদরা সে-পথে চিন্তা করতে নারাজ। ফলে যে-করে-হোক পরীক্ষার

ফলাফলকেই অস্বীকার করতে হয়; তাই বুর্জোয়া জীববিজ্ঞানীরা এই জাতীয় দৃষ্টান্তকে "নকল-বংশগতি" বলে উপহাস করবার ধারা প্রবর্তন করেছেন। সনাতনবাদের প্রতি প্রবল তাঁদের ভক্তি, পারিপার্শ্বিককে পরিবর্তন করবার প্রসঙ্গ উঠলে তাঁদের অবচেতন শ্রেণীস্বার্থ আহত হয়, তাই বিজ্ঞানী হয়েও মেণ্ডেল-ভাইসম্যানের আধা ধর্ম-মূলক মতবাদ আঁকড়ে ধরবার আগ্রহে বাস্তব দৃষ্টান্তকেও তুচ্ছ করতে তাঁদের কুণ্ঠা নেই।

লাইসেনকো কিন্তু ভিন্ন সমাজব্যবস্থার মানুষ। তাই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সময়ে যে-সব বাস্তব ঘটনা তাঁর চোখে পড়ল সেগুলির বাস্তব তাৎপর্যকে গ্রহণ করবার নির্ভিক আগ্রহ।

পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বদলে পুরনো ধরনের গাছ-গাছড়া আর গৃহপালিত পশুর বদলে নতুন ধরনের গাছ-গাছড়া আর গৃহপালিত পশু পাওয়া যায়। অজস্র পরীক্ষার উপর নির্ভর করে লাইসেনকো এ-কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখাতে পারলেন। তাঁর পরীক্ষাগুলি থেকে দু-চারটে নমুনা তোলা যাক। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বদল করে লাইসেনকো বসন্তকালের গমকে শীতকালের গমে পরিণত করলেন। শীতের গম তুষার-সহিষ্ণু, বসন্তের গম তা নয়। কিন্তু বসন্তের গম থেকে লাইসেনকো যে শীতের গম পেলেন সেই শীতের গম সাধারণ শীতের গমের চেয়ে অনেক বেশী তুষার-সহিষ্ণু। আবার অপর পক্ষে, পারিপার্শ্বিকের উপর প্রভাব বিস্তার করেই শীতের গমকে তিনি পরিণত করলেন বসন্তের গমে। শুধু গমই বা কেন? অন্যান্য ফসল নিয়ে পরীক্ষা করবার ফলাফলও এই রকম। পারিপার্শ্বিকের উপর আয়ত্ত বিস্তার করে ভালো জাতের তুলো, ভালো জাতের শন ইত্যাদি নানান

ধরনের জিনিস। কিন্তু শুধু গাছ-গাছড়ার দৃষ্টান্তই নয়। গৃহপালিত পশুর বেলাতেও এই কথা। খাদ্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতিকে উপযুক্তভাবে বদল করে উন্নততর পশুর সৃষ্টি করা : এই সব উন্নততর পশুর মধ্যে কস্ট্রোমা জাতীয় গরু-ছাগল এবং এ্যাস্কানিয়া জাতীয় লোমশ ভেড়া খুব বিখ্যাত।

এই জাতীয় পরীক্ষার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর পরীক্ষায় লাইসেনকো নিজে সফল হয়েছেন : শীতের গম বদলে তিনি তৈরী করতে পেরেছেন রাইগমের গাছ !

তাছাড়া grafting-এর সাহায্যে এক রকম গাছের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্য রকম গাছের লক্ষণ সঞ্চারণ করা সম্ভব হয়েছে। একটা গাছের গায়ে ভিন্ন জাতের আর একটা গাছের কলম গেঁথে দিলে এ-গাছ ও-গাছের মধ্যে ক্রোমোসোম বা তথাকথিত জিন বিনিময় নিশ্চয়ই সম্ভব নয় ! তাই ক্রোমোসোমবাদ দিয়ে এই জাতীয় পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। শীতের গম থেকে রাইগমের গাছ তৈরি করা, ক্রোমোসোমবাদ দিয়ে এই বিস্ময়কর ঘটনার কী ব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে ? মেণ্ডেল-ভাইসম্যানের বংশগতিবাদ সত্যি কি পারে বসন্তের গম বদলে শীতের গম তৈরি করবার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে ? তুষার-সহিষ্ণুতা নামের যে গুণ সেই গুণের জন্যে সাবেকী ক্রোমোসোম-বাদ একটি সুনির্দিষ্ট জিন সন্ধান করতে চায়, যে-জিন সনাতন অবিনশ্বর !

মিচুরিনপন্থীরা আরো অনেক অজস্র পরীক্ষা করেছেন। মনে রাখতে হবে, এ-সব পরীক্ষা শুধুমাত্র গবেষণাগারের সংকীর্ণ গণ্ডিটুকুর মধ্যে খাপছাড়া ধরনের দু-চারটে পরীক্ষা-মাত্র নয়। গবেষণাগার তো

রয়েছেই। কিন্তু সেই সঙ্গেই রয়েছে হাজার হাজার বিঘে জোড়া বিরাট ক্ষেত, হাজার কর্মী মিলে এই সব দিগন্ত-ছোঁয়া ক্ষেতগুলোয় হাজার রকম পরীক্ষা। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার এই বিরাট পটভূমির কথা ভুললে চলবে না, কেননা এই জাতীয় পরীক্ষার যাথার্থ বিচার কোটি দেশবাসীর সাক্ষাৎ-সমক্ষে। আর এই অজস্র পরীক্ষার ভিত্তিতে মিচুরিন-পন্থীরা দেখলেন, অভ্রান্তভাবে আর নিঃসংশয়ে দেখলেন. মেণ্ডেল-ভাইস-ম্যান অনুপ্রাণিত আধুনিক ক্রোমোসোমবাদ ভ্রান্ত আর বন্ধ্যা। বাস্তব ঘটনা আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত অগ্রাহ্য করে এই মতবাদ ; শান্তি, প্রগতি আর প্রাচুর্যে টলোমল নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করবার কাজে এই মতবাদ মানুষকে এক ফোঁটাও প্রেরণা যোগাতে পারে না! তাই. মেণ্ডেল-ভাইস্‌ম্যান অনুপ্রাণিত ক্রোমোসোমবাদকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে আবর্জনা জ্ঞান করা। বর্জন করা।

সাবেকী ক্রোমোসোমবাদকে বর্জন করে জীববিদ্যায় যে নতুন মতবাদকে লাইসেনকো প্রতিষ্ঠা করতে চান তার মূল কথা হল প্রাণীদেহকে পারি-পার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝবার চেষ্টাটা একেবারেই ভুল চেষ্টা। লাইসেনকো বলছেন, "প্রাণীদেহ আর তার প্রাণধারণের জন্যে যে পারিপার্শ্বিক দুয়ে মিলে একত্ব!" কেননা, প্রাণধারণ বলে ব্যাপারটার মূলে এই প্রাণীদেহ আর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অবিরাম লেন-দেন। তাই, প্রাণীদেহের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বদলে দিতে পারলে বদল হয়ে যাবে এই লেন-দেন বলে ব্যাপারটার, আর তার ফলে শেষ পর্যন্ত প্রাণীদেহটির হবে জাত বদল। প্রাণীদেহের মধ্যে এমন কোন অংশ কল্পনা করা,— যে অংশ পারিপার্শ্বিকের সমস্ত পরিবর্তনকে অগ্রাহ্য করে আপন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন সত্তায় একান্ত মশগুল,—

নেহাতই ভ্রান্ত আর অবৈজ্ঞানিক কল্পনার মোহে পড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি তাই হয় তাহলে নিশ্চয়ই মানতে হবে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বদলে প্রাণীর বংশগতিতে আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব। তার মানেই কিন্তু অর্জিত গুণের পক্ষে বংশগত গুণে পরিণত হওয়া। লাইসেনকো বলছেন, অর্জন করা গুণ বংশগত সূত্রে সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা স্বীকার না করলে প্রকৃত বস্তুবাদী ক্রমবিকাশবাদই আর সম্ভব হয় না। বর্জন করতে হয় ডারউইনকে, যদিও তার মানে ডারউইনের ভ্রান্তিগুলোকে আঁকড়ে ধরা নয়। (যেমন, লাইসেনকো দেখাচ্ছেন, জানের দায়ে যুদ্ধ একটা অতিকথা, ভুল-কথা ; অপর পক্ষে—যেমন ধরুণ বাঁশঝাড় জাতীয় গাছের বেলায়—নানান দৃষ্টান্তে প্রজাতির মধ্যে সহযোগীতার উপরই জীবের জীবনমরণ)। মিচুরিন প্রণোদিত বংশগতিবাদের এইটেই হল একেবারে মূল কথা। এবং এ-কথার যাথার্থ সোভিয়েট কৃষিক্ষেত্রে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। পারিপার্শ্বিককে ঠিকমত বদল করে অনেক অজস্র দৃষ্টান্তের বেলায় দেখা গিয়েছে প্রাণীদেহে নতুন বংশগত গুণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

তাহলে, লাইসেনকো-মিচুরিনের বংশগতিবাদটা ঠিক কী ? লাইসেনকো বলছেন, বংশগতি হল প্রাণীদেহের সেই গুণ যে-গুণের দরুন তার বাঁচবার আর বৃদ্ধি পাবার জন্যে সুনির্দিষ্ট পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন হয় এবং যে-গুণের দরুন নানান অবস্থায় তার নানান রকম প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ, বংশগত গুণের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার যোগাযোগটুকু অত্যন্ত গভীর। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বাদ দিয়ে নির্লিপ্ত কোন গুণকে বংশগত গুণ বলে কল্পনা করা নেহাতই অসম্ভব কল্পনা। তাই পারিপার্শ্বিকের কাছে প্রাণীদেহের চাহিদাগুলি ঠিক কী রকম এবং

পারিপার্শ্বিকের উপর তার প্রতিক্রিয়াই বা ঠিক কোন্ ধরনের তা জানতে পারলে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আমরা এক সুনির্দিষ্ট পথে এই প্রাণীদেহের বিকাশ এবং তার বংশগত লক্ষণকেও পরিচালিত করতে পারব।

এই মতবাদ থেকেই বুঝতে পারা যাবে প্রাণীদেহে পরিবর্তন সম্বন্ধে লাইসেনকোর মতবাদ। লাইসেনকো বলতে চান, এ পরিবর্তনের মূলে রয়েছে বিপাক বা metabolism নামের ঘটনা। বিপাক কাকে বলে? প্রাণীদেহের পক্ষে বেঁচে থাকবার জন্যে বাইরের পৃথিবী থেকে খাদ্যাদি কিছু কিছু জিনিস আত্মসাৎ করা দরকার। কিন্তু যে জিনিসগুলি প্রাণীদেহ আত্মসাৎ করল সেগুলি বাইরের পৃথিবীতে যে অবস্থায় ছিল প্রাণীদেহের মধ্যেও ঠিক সেই অবস্থায় থাকে না; এক জটিল পরিবর্তন পরম্পরা অতিক্রম করে এই জিনিসগুলি শেষ পর্যন্ত প্রাণীদেহের মধ্যে বিলীন হয় সেই ঘটনা পরম্পরার নাম হল বিপাক বা metabolism। লাইসেনকো বলছেন, এই বিপাকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে প্রাণীদেহে পরিবর্তনের আসল কারণ। এক রকম বিপাকের বদলে যখন অন্য রকম বিপাক শুরু হয় তখনই তার ফলে প্রাণীদেহে দেখা দেয় পরিবর্তন। কিন্তু বিপাকের পরিবর্তনটা হয় কেন? কারণ, লাইসেনকোর মতে, নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া। প্রাণীদেহের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় উপযুক্ত পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারলে বদলে যাবে বিপাক এবং বিপাক বদলের দরুন এই প্রাণীর চাহিদা এবং প্রতিক্রিয়া দুইই, অর্থাৎ তার বংশগত গুণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রাণীদেহের পারিপার্শ্বিককে উপযুক্তভাবে না বদলে যদি তার কোন অঙ্গকে কাটাকুটি করে তার দেহে কোন রকম খাপছাড়া অদল বদল

সৃষ্টি করা যায় তাহলে এই অদল বদলের দরুন তার বংশগত লক্ষণে কোন মূল পরিবর্তন দেখা দেবার কোন সম্ভাবনা নেই। কথাটা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার এই কারণে যে ভাইসম্যান যে সব তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে লেমার্কবাদ (অর্জিত গুণের পক্ষে বংশগত সূত্রে সঞ্চারিত হওয়া সংক্রান্ত মতবাদ) খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন সেই সব তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আসল ভিত্তি হল এই রকম খাপছাড়া আর ভাসাভাসা কতকগুলো অদল বদল সৃষ্টি করে সেগুলির অনুপযোগিতা দেখানো। ভাইস্‌ম্যানের পরীক্ষার নমুনা দেখা যাক: তিনি একজোড়া ইঁদুর ধরে তাদের লেজ কেটে দিলেন, তারপর সেই ইঁদুর জোড়ার যে বাচ্চা হল সেগুলোর লেজ কেটে দিলেন এবং এই ভাবে পরপর উনিশটি বংশের ইঁদুর হল লাঙ্গুলচ্যুত। কিন্তু তারপরও লাঙ্গুলহীন অবস্থায় কোন ইঁদুর সন্তান জন্মগ্রহণ করল না দেখে ভাইসম্যান ঘোষণা করলেন, অর্জন করা গুণ বংশগত সূত্রে সঞ্চারিত হয় না। কিন্তু এ জাতীয় পরীক্ষা যে আসলে হাস্যকর তা দায়িত্বশীল বুর্জোয়া বিজ্ঞানীরও চোখ এড়ায়নি। সি, এইচ, বেস্ট (C. H. Best)—ইন্‌সুলিনের সহ-আবিষ্কারক ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক—স্পষ্টই বলছেন ভাইসম্যানের এই রকম পরীক্ষা আসলে ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্জন করা গুণ বলতে এই রকম খাপছাড়া অঙ্গহানি নিশ্চয়ই বোঝায় না। লাইসেনকোর মতে, অর্জন করা গুণ হল বিপাক বা metabolism নামের জটিল পরিবর্তন পরম্পরার গভীর ফল। সেই ফল প্রাণীদেহে দেখা দিলে তা বংশগত সূত্রে সঞ্চারিত হয় এবং বৈজ্ঞানিক যদি সচেষ্ট হন তা হলে এই জাতীয় ফল তিনি প্রাণীদেহে ফলাতে পারেন।

এর থেকেই বুঝতে পারা যায় লাইসেনকোর প্রমাণ অনুসারে বংশগতি বলে ব্যাপরটা প্রাণীদেহের শুধুমাত্র ক্রোমোসোমকে কেন্দ্র করে অবস্থান করে না ; তার অবস্থান প্রাণীদেহের প্রত্যেক বস্তু বিন্দুতে। প্রাণীদেহের যে কোন অঙ্গের উপর নব্য পারিপার্শ্বিকের প্রভাব সঞ্চারিত হলে— এবং এই অঙ্গটি যদি নব্য বংশের সূত্রপাতের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তাহলে—নবজাত সন্তানের মধ্যে নব্যগুণ, অর্থাৎ এই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের দরুন যে গুণ সেই গুণ সঞ্চারিত হবে। অবশ্যই বিশেষ করে জননকোষের পরিবর্তনের উপরই বংশগত গুণের পরিবর্তন নির্ভর করে ; কেননা এই জননকোষের সঙ্গেই নব্য বংশের সবচেয়ে সাক্ষাৎ যোগাযোগ। কেবল মনে রাখতে হবে, প্রাণীদেহের এই জননকোষ-গুলি অন্যান্য কোষের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিরহিত বস্তু নয় ; পুরো প্রাণীদেহ গড়ে ওঠবার দরুনই জননকোষগুলি গড়ে উঠতে পারে, এবং প্রাণীদেহের উপর যেহেতু পারিপার্শ্বিক অবস্থার গভীর প্রভাব সেই হেতু জননকোষগুলিও এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

অবশ্যই বংশগতির পরিবর্তন, লাইসেনকোর মতে, খাপছাড়া আর আকস্মিক পরিবর্তন নয়। নতুন পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে পড়লে প্রাণীদেহে প্রথম দেখতে পাওয়া যায় এক অস্থির অবস্থা বা destabilization। "নতুন পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে পড়া" বলে ব্যাপারটাও রীতিমত জটিল। প্রাণীদেহটির পক্ষে গড়ে ওঠবার কোন্ বিশেষ স্তরে ঠিক কোন্ রকম বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার মধ্যে এই অস্থির দশা বা destabilization সৃষ্টি করতে পারবে তা নির্ণয় করতে হুঁসিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রয়োজন আছে বই কি। এক গাছের উপর আর এক গাছের কলম পুঁতে, কিম্বা গাছটি গড়ে ওঠবার এক বিশেষ

অবস্থায় তার জন্যে সার, উত্তাপ ইত্যাদিতে নানারকম অদল বদল সৃষ্টি করে, তবে হয়তো গাছটির বেলায় এই রকম অস্থির দশা সৃষ্টি করা সম্ভব। এই পদ্ধতির খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা আপাতত নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। লাইসেনকোর মতবাদ বোঝবার জন্যে উপস্থিত মনে রাখা দরকার তিনি পরীক্ষা করে দেখাচ্ছেন যে বংশগতির পরিবর্তনটা এক লাফে হয় না; মাঝখানে একটি অস্থির দশা অতিক্রম করে তবেই এই পরিবর্তন। লাইসেনকো দেখিয়েছেন, এই অস্থির দশা একবার সৃষ্ট হলে পর তাকে নির্দিষ্ট পথে নিয়ে গিয়ে পাকাপোক্ত বংশগত লক্ষণে পরিণত করা সম্ভব।

পাদটীকা

1. The Situation in Bilogical Science P. 522.
2. S. Vavilov
3. Frederic Joliot-curie.
4. Science & Society. Vol. XIII, No. 1.
5. Ibid.
6. Darwin : The Origin of Species (Thinker's Library) P. 2.
7. Ibid P. 3.
8. Ibid Chapter 1.
9. Ibid P. 3.
10. Ibid P. 3.
11. Ibid P. 4.
12. New Times. 1950 No. 22.
13. The Origin of Species. P. 3.
14. Eneyclopædia Britannica. 14th, Ed. "Weissmann".
15. Ibid.
16. Science & Society. Vol. XIII, No. 1.
17. Ibid.

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জীববিজ্ঞানে বিপ্লব

সোভিয়েট দেশে ১৯৪৮-এ জীববিজ্ঞান নিয়ে তুমুল সমালোচনা হয়, শেষ পর্যন্ত ঘোষিত হয় মিচুরিন্‌-লাইসেনকোর বিপ্লবী জীববিজ্ঞানের জয়। একেবারে ঘরোয়া ভাষায় তারই পরিচয় এই গ্রন্থে, বোঝবার যাতে সুবিধে হয় এই জন্যে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসটুকুর খসড়াও করা হয়েছে।